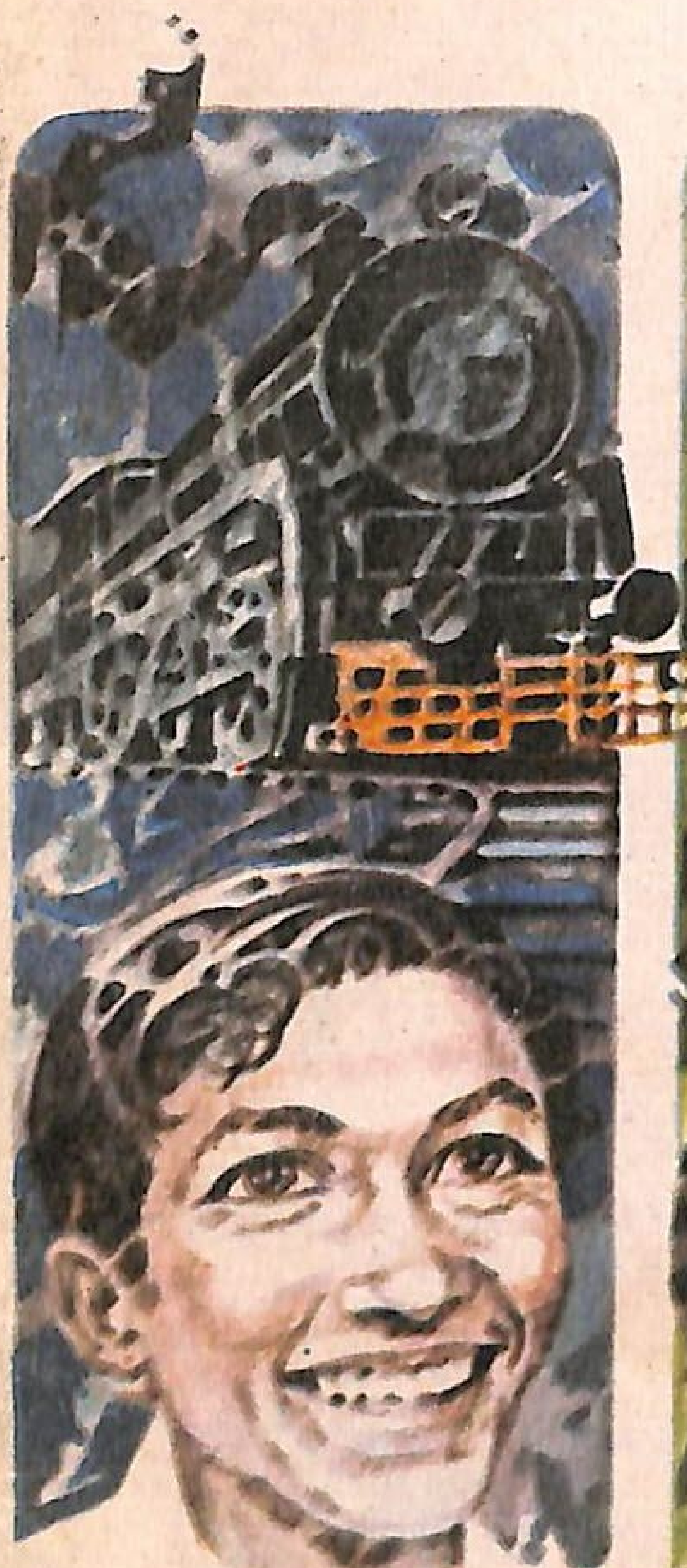
ভারতের বীর কিশোর-কিশোরী

সিগরুন শ্রীবাস্তব

4·8

৯৮০







নেহরু বাল পুস্তকালয়

ভারতের বীর কিশোর-কিশোরী

সিগরুন শ্রীবাস্তব

চিত্রকর

রবি পরাঞ্জপে

অনুবাদ

গুরুদাস ভট্টাচার্য





ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

1986 (শক 1907)

Original Title : INDIA'S YOUNG HEROES *(English)*
Bengali Translation : BHARATER BEER KISHORE-KISHOREE

Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area, Delhi-110032

সূচীপত্র



নিমলা, সয়াল এবং সাপটা

সয়াল লহনুবাঈ ভোয়াকে নির্মলার একদম ভালো লাগত না। এককথায়, দুচোখে দেখতে পারত না। ওর মাথায় কিছুতেই আসত না, কেন-যে সবাই সয়ালের মা কল্‌গীবেনকে বলত : "ও কল্‌গীবেন, বড়ো মেয়ের দিকে নজরটা রেখো গো—যাকে বলে, ডাকসাইটে সোঁদর। হাসিটি কী মিঠে! ওতেই ছোঁড়াদের মাথাগুলান যা ঘুরিয়ে দেবে না!"

'মিঠে হাসি না দেঁতো হাসি!' রাগে গজ গজ করত নির্মলা। তবু মনে মনে ওকে মানতেই হত : কেমন-যেন একটা জাদু আছে সয়াল লহনুবাঈয়ের ওই হাসিতে—ডিমের ছাঁদের তুলতুলে মুখের ওপর হঠাৎ যখন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, বড় বড় ভাবুনী চোখ দুটো চিকমিক করতে থাকে, ছোট্ট চাপা নাকটা একটু কুঁচকে যায়, আর দুটি নরম সুডোল গালে দোল খায় টলটলে একজোড়া টোল।

বেশ তো, তাই সই—ওর হাসিতে নাহয় জাদু ঠাসা আছে; কিনতুক তাই বোলে ওর ওই হাজারো ফোঁড়-দেওয়া জামা কিংবা রং-চটা শাড়িতে তো আর নেই! আর, এক-এক হাতে ওইযে তিনটে ক'রে হাতির দাঁতের ফঙফঙে বালা—নির্মলার ঝকমকে চওড়া বালাদের পাশে দাঁড়াতেই পারে না! তারপর, তার সেই লাল সুতোয় গাঁথা টকটকে লাল দানার ঝিকিমিকি হার—গুজরাতের এই খুদে আদিবাসী গাঁ বরুতাদে আর কোনো মেয়ের আছে?...একদম না! খোদ সরলাই তো সেদিন তারিফ করছিল, সেই-যে যেদিন ঝরণার ধারে দেখা হল কাপড় কাচতে গিয়ে—

"কী সোঁদর রে নির্মলা!" আগ বাড়িয়ে বলেছিল সয়াল, "দেখি, দেখি।"

হুঁ, দেখাতে বয়েই গেছে নির্মলার! নাক ফুলিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর কাপড় আছড়াতেই থাকে দমাদ্দম।

হঠাৎ সয়াল বলে ওঠে, "দ্যাখ দ্যাখ, একটা বয়া পাখি!"

"বয়া না, ওটা চড়ুই।"

"নারে নির্মলা—পাখিটার বুকে যে হলুদের ছোপ? তুই কী করে বললি ওটা চড়ুই!"

নির্মলা পাখিটাকে দেখে আরেকবার—আরে, ঠিকই তো, একেবারে আলাদা! সয়ালেরই জিত—এবারেও। আর এই ব্যাপারটাই নির্মলা সইতে পারে না—সয়াল লহনুবাঈ ভোয়া যা বলে সব ঠিক, যা করে তাও ঠিক। সব সময়ে! এমন ভাব করে, যেন সবজান্তা!! হাঁ, শুধু একজন...গোটা গাঁ ঘুরে ওই একজনই আছেন যিনি সয়ালকে শেখাতে পারেন—পাঠশালার গুরুমশাই। ভালোও লাগে বটে ওর ইসকুল-পাঠশাল!...নির্মলার? দূ—র! ফাঁক পেলুম কি ভাগল্ ভাগ, মাঠে-ময়দানে।

"নির্মলা, নির্মলা", কুঁড়ের ভেতর থেকে মায়ের ডাক আসে. "আজ আর পাঠশালায় যাস নে, আর-দিন যাস। ঘরেতে কেউ নাই যে মোষগুলানকে মাঠে নে যায়।...দৌড়ে আয় বাছা, আটটা বেজে গেছে!"

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে নির্মলা; মোষগুলোকে খেদাতে-খেদাতে গাঁয়ের পথ ধরে। গাঁ যেখানে শেষ হয়েছে, পাশেই হুমড়ি-খেয়ে-পড়া মাটির কুঁড়ে একটা। পুরনো বাসন-কোষণ কয়েকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ইদিক-সিদিক। চালের দানার খোঁজে কাহিল তিনটে হাড়-জিরজিরে মুরগি। কুঁড়ের সামনে উবু হয়ে ব'সে বছর নয়েকের একটা মেয়ে চাল বাচছে। পাশেই একটি বাচ্চা ছেলে, চাল খুঁটে খুঁটে মুখে তুলছে।

"বিজয়কুমার", ধমকে উঠল মেয়েটি, "কাঁচা চাল খাস ক্যান? তুই কি একটা পাখি?" বাচ্চাটা খিলখিলিয়ে উঠল। মেয়েটি নির্মলার দিকে মুখ তুলে একটু হাসল: "মোষগুলানকে আজ কুনদিকে নে যাস রে নিম্‌মলা?"

নির্মলা কাঁধদুটো ঝাঁকাল শুধু। সয়াল লহনুবাঈয়ের এই গায়েপড়া বোনটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই ও-যেন বাঁচে!

"খাঁড়িতে যা না ক্যান? সয়ালকেও পাবি উখেনে মোদের গাইগুলান সমেত।"

"এহ্—গাইগুলান!" মনে মনে বলে নির্মলা, "হাতগুনতি কটা তো ছাগল, তারেই বলে কিনা—গাইগুলান!!" মুখের ওপর জোর ক'রে একটা হাসি ফোটায়, "আচ্ছা ভাই, মীরা।"

আরো আধ মাইলটাক এগোবার পর খাঁড়িমুখো গো-পথ ছেড়ে নির্মলা



মোড় নেয় বন-পথে। সামনেই একটু ফাঁকা মতোন জায়গা আছে; মনের সুখে চরবে মোষগুলো।

জঙ্গলটা ভিজে-ভিজে, তবে বেশ গরম। মাথার ওপর বুনো মশাদের তালে তালে কোরাস-নাচ। পাখিদের খুশিখুশি কিচিরমিচিরে বাতাস ম-ম। ধাইমাই ক'রে একটা কাঠবিড়ালী চড়ে বসল ডুমুর গাছটায়। বিশাল দুই ডানা মেলে দিয়ে উড়ে গেল একটা বিরাট রঙচঙে ঠুঁটো পাখী। শাদা-কালো-টিপ পালক যদি দু-একটা পাওয়া যায়, এই আশায় নির্মলা ইতি-উতি খুঁজল বারকয়েক। নাঃ, পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে তাড়া লাগাল কুঁড়ের বাদশা একটা মোষকে: "এ্যাই, হুট্, হুট্।"

এসে পৌঁছল ফাঁকা জায়গাটায়। খুশী খুশী!...ভেতরে পা দিয়েই মনটা বিষিয়ে গেল—ওর সেই পেয়ারের বটগাছটার ঠিক নীচে, যেখানে ও রোজ বসে, গাছে পিঠ দিয়ে কে-একজন যেন বসে আছে! বছর বারো বয়স, দেখতে মনে হয় আরও ছোট। সিঁথিকাটা চুল দুপাশে আঁচড়ে টেনে পেছনে ঝুঁটি বাঁধা, তার ওপর আধ-শাড়ির আঁচলটা তোলা। লিকলিকে পা দুটো মুড়ে বসে বসে সপনই দেখছে বুঝিবা—কে আবার?—সয়াল লহমুবাঈ ভোয়া!

মোষের গলার ঘণ্টার টুং টাং শুনে চোখ তুলল সয়াল। মুখের ওপর ঝলসে উঠল সেই খুশি খুশি হাসি। হাত নেড়ে ডাকল, "আরে, নির্মলা! আয়, এই ছায়ায় আয়।"

এতো আদরের ডাকের কোন সাড়াই দিল না নির্মলা, মোষগুলোকে নিয়ে যেন কতো কাজ ওর! মনে মনে ঠিক করল: "খাঁড়িতেই যাই...কিংবা আর কুথা। এখেনে, ওর কাছে? কদাপি না!"

"আয় না নির্মলা", সয়াল আবার ডাকল, "ভারী মজার জিনিস একটা দেখাব তোকে!"

মজা! নির্মলার যেন জানতে বাকি আছে, সয়ালের মজার জিনিস কতো মজারই না হবে! ভ্যাতামারা একবেঁয়ে—ঠিক ওই পাঠশালার মতোন। রাগের চোটে পায়ের আঙুল দিয়ে একগোছা মোটা ঘাসই চেপে ধরল।

নরম রসাল ঘাসের খোঁজে মোষগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক-ওদিক। আশপাশে আলগোছে তাকাতে তাকাতে নির্মলার চোখে পড়ল একটা ঝোপঝাড়ি, কোলভরা মুঠো মুঠো ছায়া যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে! হাঁটু-উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে ও এগিয়ে চলল।

"এই নির্মলা ! এখেনে আসিস না ক্যান ?"

"ফুঃ !"—ঠোঁট বেঁকিয়ে নাকটা কোঁচকাল নির্মলা।

"হিস্‌স্‌স্‌ !"

নির্মলা পাথর !

"হিস্‌স্‌স্‌ !"

আওয়াজটা কানে আসতেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি নেমে এল। ঘুরে দাঁড়াতেই, সোজা একজোড়া আগুনের ভাঁটার চোখে চোখ—সাপের রাজা : অজগর ! লম্বায় বারো ফুটেরও বেশি। ধূসর-সবুজ আঁশটে দেহটার ওপর হীরেকাটা গাঢ় খয়েরী ছোপ সারিসারি। তলার দিকটাও ধূসর, তার ওপর হলুদ-খয়েরের টিপ পরপর।

নিমেষে দুহাত মুখের ওপর। নির্মলা চিৎকার করে উঠতে চাইল, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। দেহ অবশ। শুধু, পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল সরীসৃপটার চোখের কালো কালো গোল তারার দিকে। কড়া রোদের ঝাঁঝে ছোট হয়ে আসছে তারা দুটো।

"হিস্‌স্‌স্‌ !"—এক ঝটকায় সাপটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল।

এরকম একটা ভয়ংকরের মুখোমুখি নির্মলা জীবনে কখনও হয়নি। শোনেও নি কখনও কারও কাছে। "বাঁচাও, বাঁচাও" ব'লে ও আবার চেঁচাতে চাইল, ছুটে পালাতে চাইল। কিনতু কোনটাই করতে পারল না ; সাপটা ওকে যেন জাদু করে ফেলেছে। বুড়ী লছমীবাঈ কতো জানে ; সাপ-কুমীর গিরগিটিদের যেসব গপ্পো বলে, সব সত্যি। সাপেরা মানুষকেও জাদু করে। কথাটা একদম মিছে না।

"হিস্‌স্‌স্‌"—অজগরের মাথাটা ছুটে এল ওর দিকে। চোখের পলক ফেলার আগেই লেজটা দুপাক জড়িয়ে গেল দু-হাঁটুতে। চাপের চোটে হাড়গোড় পিষে যেতে লাগল ; গোটা দেহটাই যেন ভেঙে যাবে। কেঁদে ফেলল নির্মলা—যাতনায়, তার চেয়েও বেশি, ভয়ে। মরে যাবার ভয়। মনে মনে চেঁচাল : "বাঁচাও, মা, মাগো, বাঁচাও আমাকে !...মরে গেলাম আমি।"

তবু, তখনো সাহস একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল সরীসৃপটাকে ; হাত তুললও ; কিনতু কিছুতেই ছুঁতে পারল না। 'সাপ ছুঁলে কুষ্ঠ হয়', সবাইকে ও বলতে শুনেছে। সাপটা এতো বড়ো, ওকে গোটা গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। হাঁ, কোন-কোন সাপ তাও করে—বুড়ী লছমীবাঈ কতোবার শুনিয়েছে ওদের।

ভয়ে চোখ বড়ো হয়ে যায় নির্মলার, পাতা পড়ে না। পলকহীন চোখ মেলে পাকখাওয়া সাপটাকে শুধু দেখতে থাকে। কোমরে আর-একটা পাক দিতে যাবে, একটা বাঁশের লাঠির ঘা খেয়ে শয়তানটা থমকে দাঁড়াল। সয়াল! সয়াল এসে গেছে !!

সোজা শিরদাঁড়ার ওপর লাঠির পর লাঠি পড়তে থাকল দমাদদম। অজগরের বিরাট দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠল। পাক তবু আলগা করল না।

"সয়াল", চেঁচিয়ে উঠল নির্মলা, "আমি মলাম রে সয়াল!"

"না, না, মরবি নি তুই!" পাকমারা সাপটাকে বেপরোয়া পিটোতে পিটোতেই সয়াল ওকে সাহস দিতে থাকে।

"বিষের আভাস পাই যে"—নির্মলা কাঁদতে থাকে।

"দূর, এটা অজগর, বিষ নেই"—সয়াল জোর দিয়ে বলে।

"আমি যে নড়তে পারি না!"

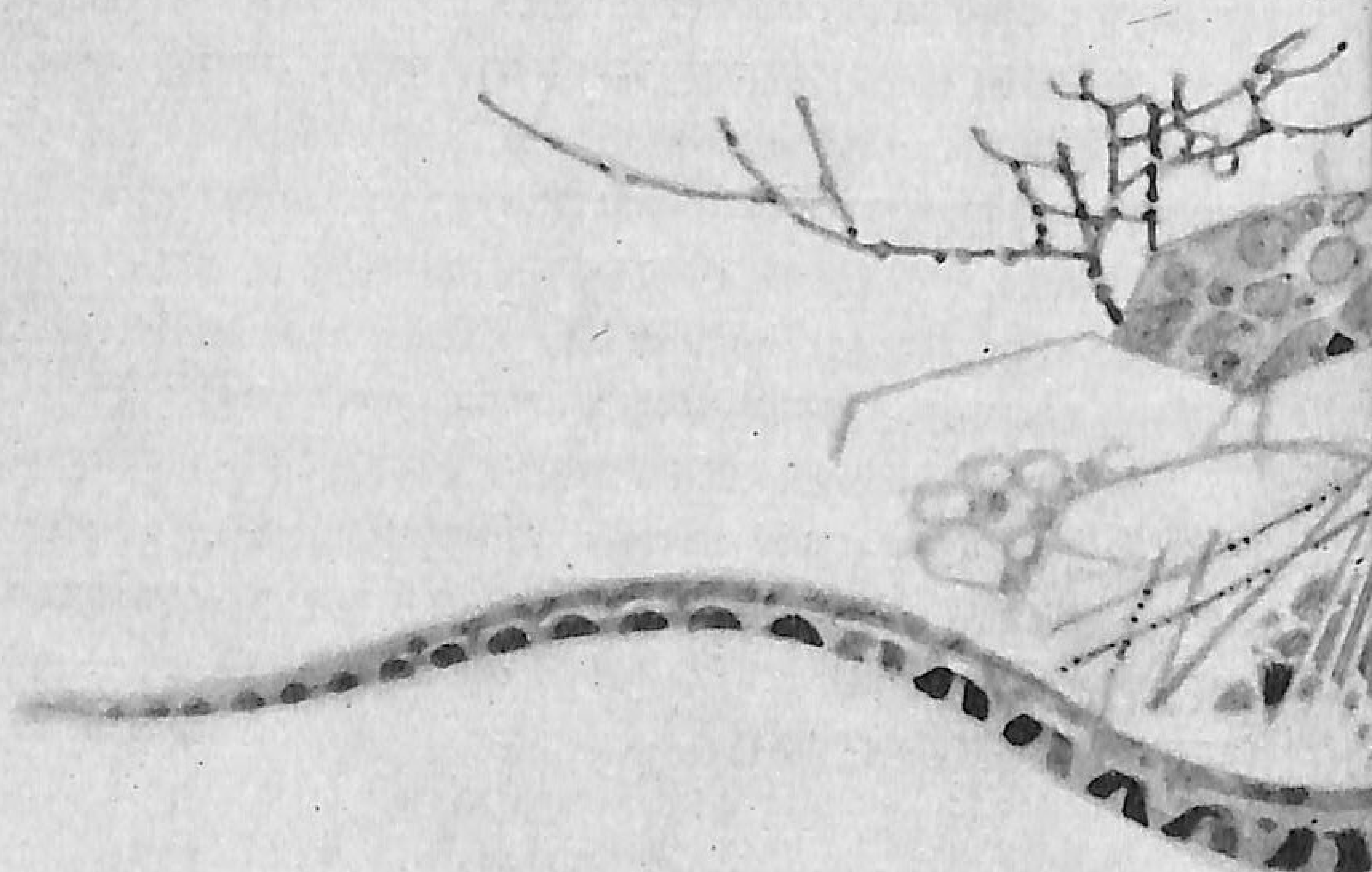
"ভয়ে ঘাবড়েচিস, তাই নড়তে পারিস না। দেখচি আমি।"

বিকট জানোয়ারটাকে লাঠি দিয়ে কাবু করা গেল না দেখে ওটা ফেলে দিয়ে সয়াল দু-হাতে চেপে ধরল সাপটার চোয়াল, চিরে ফেলতে চাইল।

"তোকে কাটবে রে সয়াল!"

"কাটবে না", দাঁত চেপে সয়াল বলে, "পারবে না।"

"পা...উহ্‌হ্‌...আমার পা চুরচুর করে দিলে—"





"থীর হ, নির্মলা, একটু থীর হ !"

নির্মলা ঢোঁক গিলল। চোখ মেলে দেখল : সয়ালের টান-হয়ে-যাওয়া মুখ ; দেখল : সাপের মুখটা হাঁ করাতে চাপ দিয়ে চলেছে কাঁপাকাঁপা একজোড়া ছোট্ট লালচে হাত ; আরও দেখল : দাঁতে দাঁত চেপে সয়াল সরীসৃপটার গলার মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল ! কপালে ওর ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ; হাত বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ও-কি সয়ালের না ওর নিজেরই রক্ত ?

সাপটা ভীষণভাবে ধড়ফড় করে উঠল। গায়ে কী জোর ! সয়াল... সয়াল কিছুতেই পারবে না ওর সাথে। ওটা দুজনকেই মেরে ফেলবে।

হঠাৎ সাপটার চোয়াল ফট্ করে খুলে গেল।

গায়ের সব জোর দিয়ে চেরা চোয়াল দুটো চেপে ধরে সয়াল চেঁচাল, "পা ছাড়িয়ে নে, নির্মলা। মার, লাথি...লাথি মার।"

পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এবং সাপটারই মতো ধড়ফড়-মোচড় দিতে দিতে নির্মলা দেহটা টানা-হ্যাঁচড়া করতে লাগল। পায়ের চারপাশে চাপটা একটু-যেন আলগা হল। এইবার একটা জোর লাথি, আর একটা হ্যাঁচকা টান—ছেড়ে আসে দেহটা সাপের পাক থেকে। পাশের দিকে লাফ দেয় নির্মলা। আজাদ... আজাদ...আঃ !

কিনতু ঘাসের ওপর লড়াই তখনও চলেছে, আগের চেয়েও ভয়ংকর।

"ছোট্"—চাপা গলা সয়ালের : "নির্মলা, বাঁচতে চাস তো ছুট্ দে।"

না, নির্মলা পালাতে পারল না। ওকে থাকতেই হবে, সহায় দিতে হবে। কিভাবে, সেটা বুঝতে পারছে না ; শুধু দেখছে : অজগরের মাথাটাকে রুখতে গিয়ে সয়ালের পাতলা কাঁধ দুটো কাঁপছে...কাঁপছে...কাঁপছে !

"হিস্‌স্‌স্‌স্ !" এক দমকে সাপের মাথাটা এগিয়ে যায় সয়ালের বুকের কাছে। তবু ও চোয়াল ছাড়ে না, তেমনি দুফাঁক করে চিরে ধ'রে পেছনে বেঁকে যায় ধনুকের মতো। জানোয়ারটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে আবার বলে : "ভাগ্ নির্মলা, ভাগ্।"

"কিনতুক সয়াল, তুই...তোকে..." কাঁদতে থাকে নির্মলা, আর ভয়ে নিথর হয়ে দেখতে থাকে : কী ভীষণ রাগে সাপটা সয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল !

"সয়াল ! সয়াল রে !"

"ছোট্...ছোট্"—সয়ালের কথা জড়িয়ে আসছে এবার।

সব আশা যখন নিভে যায়, কোথা থেকে একটা অজানা জোর এসে যেন

ভর করে। সয়ালেরও তাই হল। শরীরের শেষ জোর, সবটুকু জোর দিয়ে রাখ্‌খোসটার ভয়াল মাথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একদিকে, নিমেষে উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে, একলাফে চলে এল ওর আওতার বাইরে।

"ছুট্‌ লাগা নির্মলা, মোষগুলান যিদিকে।"

নির্মলা দৌড় দিল। পেছন ফিরে তাকালও না একবার। চাইলও না।... চাইলেও কি তাকাতে পারত ?—কখ্‌খনো না! অতএব, শুধু সামনের দিকে চোখ রেখে ছুট্‌ ছুট্‌ ছুট্‌!

একটু পরেই সয়াল ওকে ধরে ফেলল। হাত ছুঁয়ে কাছে টেনে নিল। একসাথে ছুটতে ছুটতে দুজনে এসে থামল ফাঁকা জায়গাটার উলটো দিকে, যেখানে মোষগুলো চরছিল মহা আরামে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দুজনে তাকাল দুজনের দিকে। কারও মুখে কথা নেই নির্মলার দু-চোখ জল-টলটল, ঠোঁট কাঁপতে থাকে থরথর।

"কাঁদিস না", সয়াল ফিসফিস করে বলে, "আমি বলচি, তুই ঠিক হে যাবি"।

"তা হয়ে যাব। কিনতুক সয়াল! সাপটা, শয়তানটা, আমাকে খেয়েই ফেলত। যদি না তুই—"

"—শ্‌শ্‌শ্‌, ছাড় ওসব কথা। যা হয়ে গেচে, ফুরিয়ে গেচে।"

নির্মলা চেয়ে চেয়ে দেখে সয়ালকে, যেন জীবনে এই প্রথমবার দেখছে। তারপর চুপি চুপি বলে, "সয়াল! মোর হারটা তোকে দিতে চাইচি।"

"কেন নির্মলা, কেন ? আমি তো জানি, মোর জায়গায় হলে তুইও ঠিক ওই কাজ করতিস! কী, করতিস না ?"

মাথা নীচু ক'রে নির্মলা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে ফিস-ফিসিয়ে জবাব দেয় : "জানি না, আমি একদম জানি না।"

কথা শেষ করেই কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে হারটা খুলে ফেলে, অনুনয়ের সুরে বলে, "নে, নে ভাই তুই।"

বালিকার দুই চোখের দিকে বেশ অনেকখানি সময় চেয়ে থাকে সয়াল লহনুবাঈ ভোয়া। একটু একটু ক'রে ওর তুলতুলে শাদাটে মুখের ওপর একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ে, সেই মন-কাড়ানিয়া ঝলমলে হাসি।

"নেব রে", নরম সুরে ও বলে, "নেব আমি।"

আর এক সেকেনড দেরি হলে

ছটফট করছিল গোবিন্দন : ঘণ্টাটা বাজবে কখন ! না, না, ইসকুল ওর খারাপ লাগত বলে নয়, মোটেই না। বরং ভালই বাসত ইসকুলটাকে, খুবই ভালবাসত, বিশেষ করে ইংরেজীর টীচার মিসেস শিত্রা লেহাকে। বলতে গেলে, একরকম অনুগতই ছিল ওঁর।

পড়াশোনাতেও খুব মন ছিল তামিলনাড়ু কুরুবরপল্লী হাই ইসকুলের আট কেলাশের সেরা ছেলে গোবিন্দনের। তবে হ্যাঁ, আর-একটা জবর নেশা ছিল—গাঁ-পাড়া ঘুরে বেড়ানো এবং মজার মজার সব জিনিস বা নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বা'র করা। আর, একটি তেরো বছরের বালকের কাছে পল্লবী রাজাদের আমলে তৈরি পুরনো নটরাজন মন্দিরের চেয়ে বেশি মজার আর কী হতে পারে! সেখানেই আজ ইসকুলের পর যাবার কথা—ওর আর রবির। সেই কথাই ভাবছিল। আর, তাই এতো ছটফটানি।

"গোবিন্দন!" মিসেস শিত্রা লেহার ডাকে গোবিন্দনের হুঁশ ফিরে এল। এক ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল; ছোট-ছোট কোঁকড়ান চুলগুলো দুহাত দিয়ে ঠিক করে নিল। চোখ তুলতেই দেখল : টীচার ওরই দিকে সোজা তাকিয়ে আছেন। একটু লালও যেন হয়ে উঠল।

"ইয়েস, মাদাম?"

"এই খাতাগুলো আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো, কেমন? ছুটির ঘণ্টা তো হয়ে এলো; চাও তো, এখনই যেতে পারো।"

"আচ্ছা, মাদাম।"

ক্যামবিশের ব্যাগটা তুলে নিয়ে গোবিন্দন এগোল দরজার দিকে। রবির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে, ইচ্ছে করেই একটা ধাক্কা দিল ওকে; ও মুখ তুলে তাকাতেই চোখ টিপে ইশারা করল। জানিকীরামের মিঠে-নারকেলের ধাবায়

দুজনের জোটবার কথা, বরাবরই যেমন জোটে। সেইটেই পাকা করে গেল আর কি!

কিনতু পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যায়। অর্থাৎ 1979 সেপটেমবরের 3 তারিখে গোবিন্দন বা রবি দুজনের কেউই হিসেবমতো পৌঁছতে পারল না জানিকীরামের পুরনো ধাবায়।

* * * *

বগলদাবা খাতার বোঝা নিয়ে বাইরে পা দিয়েই গোবিন্দন চোখ বোলাল চারিদিকটায়ঃ সামনেই কুরুবরপল্লীর বড় সড়ক এঁকেবেঁকে চলে গেছে নারকেল-বাগান আর জল-থইথই চাষখেতের মাঝ দিয়ে; বাঁদিকে মাইল দুয়েক দূরে খড়ে-ছাওয়া একঝাঁক কুটির বিকেলের ভাপা রোদে চান করছে; তার ওপাশে, গাঁয়ের বাইরে, এখান থেকেই দেখা যায়, খ'য়ে-যাওয়া সেই নটরাজন মন্দিরঃ ভরাট ধানখেত আর মাথা-নাড়া-দেওয়া তালগাছগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিগত দিনের ফেলে-আসা গৌরব-মহিমার স্বপনই দেখছে বুঝিবা!

ইসকুলের উলটো দিকে, সড়কের ডাইনে একটা ভারী ট্রাক দাঁড়িয়ে। তার পেছন থেকে খুট্‌খুট্‌ করে বেরিয়ে এলো একটা লোক কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে ফেলে। ট্রাক-ড্রাইভার? উঁহুঁ, খুব বুড়ো, যাকে বলে থুথ্‌থুরে। কেমন-যেন মাথাটা চট্‌ করে ওঠাল, ঢুকে-যাওয়া কালো কালো চোখে সোজা তাকাল সূয্যির দিকে! খালি পা; কোমরে যেমন-তেমন করে বাঁধা রংচটা লুংগি একটা। বাঁ হাতে লম্বা লাঠি, তাই দিয়ে সামনের জমিনটা ঠুকতে-ঠুকতে এগিয়ে আসছে। ডান হাতে একটা বাটি, থরথর কাঁপছে।

"ভিখিরি", মনে-মনে বলল গোবিন্দন, "ঈশ্‌শ্‌! বেচারী কানা!!"

মমতায় মন ভরে গেল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল গোবিন্দন; শাদা সূতীর শার্ট, তার বুকপকেট খুঁজল—যদি থাকে এক-আধটা পয়সা। নাহ্‌, নেই। আর-কিছু কি নেই ওকে দেবার মতো? "ইসকুল ব্যাগে থাকতে পারে," ভাবল ও।

বইখাতার ভেতরে কিছু আছে কিনা, ঝুঁকে দেখতে গেছে, হঠাৎ ওর কানে এলো মোটর-ইনজিনের আওয়াজ। মাথা তুলল—সামনেই খাঁ খাঁ সড়ক...দূর থেকে একটা লরী ছুটে আসছে পাগলের মতো।

অবাক গোবিন্দনঃ এতো জোরে আসছে কেন? সামনেই মোড়ে ওই সাংঘাতিক বাঁকটা রয়েছে—লরীওয়ালা না দেখতে পাবে পথের এদিকে দাঁড়ানো





গাড়িটা, না দেখতে পাবে তার পেছনের কানা লোকটাকে !

"দেখে, দেখে !" আপনিই বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে, লোকটিকে সাবধান করে দিতে। "একটা লরী আসছে, সোজা তোমারই দিকে।"

বলার পরেই ওর খেয়াল হল, কথাগুলোর কোন মানে হয় না—বুড়োটা যে কানা ! লরীটা তো দেখতেই পাবে না, কোন্ দিকে যেতে হবে, তাও ঠাওর করতে পারবে না বেচারী।

ওর চিৎকার শুনেই হয়তো ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে পড়ল, এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে লাগল জোরে জোরে, মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একটা আকুলি-বিকুলি ভাব। শেষে, তাকাল গোবিন্দনেরই দিকে। তাকাল, কিনতু দেখতে পেল না ওকে।

ওদিকে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে লরীটা ছুটে আসছে আরও জোরে।

"আরে, একটা-কিছু তো করতে হয় !"—ব্যাগটা, বগলের আটতিরিশটা খাতা, মাটিতে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো দুহাত নাড়াতে লাগল গোবিন্দন : "এ্যাই, রোক্‌কে, রোক্‌কে...ভিখিরি, ভিখিরি..." চেঁচাতে চেঁচাতেই ও ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো লোকটার দিকে—পথের ঠিক মাঝখানে অসহায়ভাবে তখনও দাঁড়িয়ে, ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে বোবা কান্নায়। গোবিন্দন আবার চেঁচিয়ে বলল : "ছোটো...বাঁচতে চাও তো ছোটো।"

হায়, হায়, কাকে বলা ! ওতো জানেই, বুড়ো লোকটা দৌড়তে পারবে না। দৌড়তে যদি কাউকে হয়ই তো সে একজনই—সী. গোবিন্দন। যা করার ওকেই করতে হবে, এবং এখনই...এই পলকে। নইলে, অনেক দেরি হয়ে যাবে !

সামনে একটু ঝুঁকে পা তুলল গোবিন্দন...খালি পা। এক ছুটে ইসকুলের উঠোনটা পেরিয়ে চলে এলো বাইরে। পথ। পথের ওপর পা দিয়েই হাত তুলল লরীটার দিকে : "রোক্‌কে, রোক্‌কে...ধীরে !"

দানবের মতো ছুটে আসছে গাড়ীটা। মাথা ঝাঁকাল লরীওয়ালা :

"গাঁইয়া ছেলেটার কারবার ছ্যাখো...লরী চাপবার শখ হয়েছে নাকি, এ্যাঁ !... আরে, আরে, করছেটা কী ? রাস্তা পেরোবে ? এইর'ম ক'রে ? বোকার ডিম...এ্যয়্...সব্বোনাশ !"

হর্ন বাজাতে বাজাতে ব্রেকের ওপর সজোরে পা চেপে ধরল চালক ; মনে-মনে বলল : "হড়কে গেলাম তো খতম একেবারে !"

হাওয়ার গতিতে গোবিন্দন পৌঁছে গেল ওপারে, থামল না, দুপায়ে চাপ দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। ধাক্কা খেয়ে কাৎরে উঠল বুড়োটা। হাত থেকে ছিটকে পড়ল লাঠি, বাটি। দুজনে গড়িয়ে পড়ল পথের ওপর।

বুড়োকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওকে বুকের ওপর নিয়ে, পতনের সব আঘাতটাই গোবিন্দন নিজের ওপর নিয়েছিল। উড়োজাহাজ আছড়ে পড়ার মতো ওরা ছিতরে পড়েছিল এব্ড়ো-খেব্ড়ো পথের ওপর। একটা কাঁকড় পট্ করে বিঁধে গেল ওর হাঁটুর কাছে ; কুঁকড়ে গিয়ে ও চোখ বুঁজিয়ে ফেলল।

দুজনের গা ঘেঁষে লরীটা বেরিয়ে গেল 'কিচ্ চ্...চ্' আওয়াজ করতে করতে ; বিশ গজেক মতো গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু বুঝতে না পেরে ভিখিরিটা কেঁদে উঠল : "হায় ভগবান ! কী, হলটা কী ?"

গোবিন্দন জোর করেই চোখ খুলল, তাকাল ঝাপসা মরা ঢুকে-যাওয়া একজোড়া চোখের দিকে। দেখেই ও কেঁপে উঠল। তবু, ঢোঁক গিলে, গলায় দম এনে ফিসফিস ক্রে বলল : "আমরা বেঁচে গেছি দাদু, ভয়ের কিছু নেই।"

কাশতে কাশতে বুড়ো হাহাকার করে উঠল : "ভয় ?...কিসের ভয় ?... আমি...আমি—আ—লাঠিটা কই গেল ? আমার লাঠি ? ওটা ছাড়া আমি তো মরা, বাপ !"

"আমি এনে দিচ্ছি দাদু", গোবিন্দন বলল, "এখন ওঠো তো।" বুড়োকে দাঁড় করিয়ে কনুই ধরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল।

কড়াৎ করে হাঁটুটা ককিয়ে উঠল ! হাত কাঁপছে, গাল দিয়ে রকৃত গড়িয়ে পড়ছে। হাতের পিঠ দিয়ে গাল মুছে নিয়ে গোবিন্দন ঘুরে দাঁড়াল লাঠিটার খোঁজে।

আর, ঠিক তখনই ও দেখতে পেল : লরীওয়ালাটা মুঠো পাকিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। কপালে টেনে নামানো টুপিটার তলায় চোখ দুটো রাগে গনগন করছে। কী-যেন একটা বলল গজরাতে গজরাতে। অন্য ভাষায়। গোবিন্দন ঠিক বুঝতে পারল না।



লোকটা এতো খেপে গেছে কেন? বুড়োটাকে বাঁচাতে যা করার, সবই তো গোবিন্দন করেছে! বুড়োরও তো কোন দোষ ছিল না! তবে?

"না, না", বুড়োকে ও আড়াল করে দাঁড়াল, "শুনুন তো আগে কথাটা—"

কানেই তুলল না খ্যাপা লোকটা। তুড়িলাফ মেরে গোবিন্দনের ওপর ঝাপ্‌টে পড়ে ওর জামা খামচে ধরল, তারপর ঝাঁকুনি সজোরে।

"স্যর, শুনবেন তো", গোবিন্দনের গলা এবার কাঁদ-কাঁদ! কিনতু যে-লোক ওর ভাষাই বোঝে না, তাকে ও সমঝায় কিভাবে?

ঘন ঘন হাত-পা নেড়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে বোঝাতে চায় গোবিন্দন: "দি ওল্‌ড্‌ ম্যান...ব্লাইন্‌ড্‌...নো সিয়ীং নো সিয়ীং ট্রাক..।"

মারমুখো লরীচালক মুঠো বাগায় ওকে মারবে ব'লে।

ঘুষিটা কিনতু আর পড়তে পায় না।

তার আগেই বাতাসে উড়ে আসে দলে দলে চিৎকার: "পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো!" মৌমাছির ঝাঁকের মতো পথের ওপর ছুটে আসছে কুরুবরপল্লী হাই ইসকুলের পাল পাল ছেলে: "ধর্ ধর্ বেটাকে। আমাদের গোবিন্দনকে মারছে!"

চমকে উঠে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। পংগপাল দেখে, মুঠি ঝাঁকিয়ে বললও কী-যেন একটা।

ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠল: "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে!... গোবিন্দন, আমরা আসছি! এ্যাই, ছেড়ে দাও বলছি, নইলে পিটিয়ে ছাতু করে দোব!" বলতে-বলতে একপাল নেকড়ের মতো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লরীওয়ালার ওপর। টেনে মাটিতে শুইয়েই দিত, যদি-না পেছন থেকে একটা ভারী গলার আদেশ ওদের থামিয়ে দিত: "এই ছেলেরা, করছোটা কী? সরে এসো, পথের ওপর থেকে সরে এসো।...অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হবে যে! সরে এসো সবাই...শুনতে পেলে?"

না শুনতে পেলেই খুশি হত সবাই; তবু পথ থেকে উঠে এল। বিজবিজ করে গজরাতে লাগল: "কাপুরুষ! ওকে জেলে দেওয়া উচিত।"

হেডমাস্টার মশাই হাত তুলে গোবিন্দন ও লরীচালককে একপাশে ডেকে নিয়ে এলেন। মিসেস শিত্‌রা লেহা রইলেন বুড়ো লোকটির কাছে।

"আমি বলছি, স্যর", হাঁফাতে হাঁফাতে গোবিন্দন বলে, "এই বুড়োকে বাঁচাতেই যা করার আমি করেছি। লরীওয়ালা যে কেন এতো রেগে গেছে, বুঝতে পারছি না, স্যর।"

গোবিন্দনের মাথায় আদরের হাত রাখলেন হেড মাস্টার : "মাই বয়! যা যা ঘটেছে, আমি সব দেখেছি। তোমার কারণে আমি...আমরা গর্বিত। আর এক সেকেনড দেরি হলে এই বুড়ো বেচারী মারাই পড়ত। লরীওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলছি।"

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন লরীচালকের দিকে : "ইংরেজী বুঝতে পারো?"

"একটু-আধটু।" পাশে দাঁড়িয়ে তখনও ফুঁসছিল লোকটা, "আমার অভিযোগ—আপনার ইসকুলের এইসব বিচ্চুরা—"

"—এক মিনিট, মিস্টার। তার আগে আমি বলে নি, কেন গোবিন্দন ওইভাবে ছুটে গিয়েছিল সড়কের ওপর দিয়ে। কেমন?"

ছেলের দল এক নজরে দেখছিল দুজনকে। বিশেষভাবে, লরীচালকের ওপরেই সবার ধারাল চোখ। ওরা দেখল : হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা শুনতে-শুনতে লোকটার মুখ হঠাৎ ছাই হয়ে গেল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বিড়বিড় করতে লাগল, "তাই বুঝি? ওহ্, তাই!"

তারপর গোবিন্দনের দিকে ফিরে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলল, "আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত!"



পুড়ে গেলাম, পুড়ে গেলাম

পাটনা জেনারেল হাসপাতালের ইন্টেনসিভ-কেয়ার-ইউনিটের একটা বেড। বেডে যে শুয়ে আছে, তার হাতপামুখচোখ কিছুই নজরে পড়ে না, সারা দেহে ব্যানডেজ আর ব্যানডেজ—যেন শাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি ! তার ওপর ঝুঁকে দেখছিলেন এক মহিলা আর অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন : "এই কি আমার মেয়ে !...সোনিয়া, আমার সোনিয়া"—খুব চুপি চুপি ডাকলেন বারকয়েক।

সোনিয়া সিনহা জবাব দিল না ; একটু নড়লও না। ও কি বেঁচে আছে এখনও ? হার্ট চলছে না থেমে গেছে ?

ভয় পেয়ে যান মহিলা, "ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে কি বাঁচবে না ?" ভেঙে পড়েন মিনতিতে, "ওকে বাঁচান !...ডাক্তারবাবু !...সিসটার !"

মহিলার সরু কাঁধ ছুঁয়ে ডাক্তার ওকে নিয়ে যান জানলার কাছে : "আপনি তো দেখছেন মিসেস সিনহা, আমরা যতোটা পারি, করছি।"

"জানি ডাক্তারবাবু।...আমাকে মাফ করবেন। সেদিন ওর বাবাকে হারিয়েছি ; এরপর ও-ও যদি চলে যায়, সইতে পারব না। দয়া করে বাঁচিয়ে তুলুন ওকে।"

"আমাদের দিক থেকে যা-যা করা দরকার সবই করছি। বাকিটা নির্ভর করছে ওর মনের জোর এবং কতোখানি যুঝতে পারে, তার ওপর।...বেচারী ভয়ংকর রকম পুড়ে গেছে !"

"কিনতু ডাক্তারবাবু, তিন হফ্তা হতে চলল, ও এখানে—"

"—তিন মাসও লাগতে পারে, কিংবা তারও বেশি...মানে, পুরোপুরি সেরে উঠতে—"

"ওহ্, ভগবান !"

"উঁহুঁ, কাঁদবেন না, মিসেস সিনহা। সোনিয়া, আপনার মেয়ে, অসাধারণ সাহস ওর। নইলে ও যা করেছে তা কখনোই করত না, করতে পারত না—এটা জেনে রাখবেন।"

সোনিয়া সিনহা কান পেতে শুনল : ভারী শ্বাস পড়ছে ওদের দুজনেরই, ভাইটির আর বোনটির—পুঁচকে শনৎ, সবে বোল ফুটেছে মুখে ; আর পাঁচ বছরের শালিনী ; কী মিষ্টি হয়ে শুয়ে আছে ! লেস-লাগানো সূতীর ফ্রকটা ওপরে উঠে গেছে, উদোম পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে জোর-কদমে-ঘোরা সিলিং পাখার সবখানি হাওয়া।

"গা'টা ওর ঢেকে দেওয়াই ভালো," ভাবল সোনিয়া। আর তখুনি ওর মনে পড়ল : "আহা, ক'তোদিন ওদের কাছে পাই না!"

ও থাকে পাটনায়, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছে ; পড়ে সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট-এ। ইসকুলটা ওর খুবই ভালো লাগে, দিদিমণিদেরও। তবে আরও ভালো লাগত, যদি এখানে থেকেই ও ইসকুল যেতে পারত, বিহারের এই ছোট্ট শহর আরকে—যেখানে ওর বাবা সরকারী হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসা করেন। কিনতু তা হবার নয়। বাবা যে বলেন : "ছেলেমেয়েদের আমি সবচেয়ে ভালো পড়াশোনার সুযোগ দিতে চাই, যাতে জীবনের সব রহস্যের দরজা ওদের সামনে খুলে যায়।"

'জীবনের রহস্য...দরজা খোলা'—এসবের মানে কী, সোনিয়া সিনহা ধরতে পারে নি। তবে এটা বুঝেছিল যে বাবা-মা ওর ভালো-ই চান। সেই কারণেই ও আর 'না' করে নি, মন দিয়েই লেখাপড়া করত। ছুটিছাটায় বাড়ি আসত। কখনও-কখনও কোন বিশেষ দিনে। যেমন গতকাল। কাল ছিল ওর একাদশ জন্মদিন।

কী চমৎকার কাটল দিনটা! ওর সব পুরনো সখী-সাথীরা, কাকা-কাকী-পিসে-পিসী, মাসতুতো-খুড়তুতো ভাই-বোন, সক্কলে এসেছিল। ও পরেছিল নতুন ফ্রক—হালকা-নীল, তাতে শাদা লেস ও বো ; শাদা রিবন দিয়ে বাঁধা কালো চুল। চকোলেট-মোড়া বার্থডে-কেক, তার ওপর এগারোটা মোমবাতি ; তাদের আলোয় চকচক করছিল ওর বড় বড় দুই পিংগল চোখ। কী দারুণ মিষ্টি জন্মদিন! এগারো পুরো করে বারোয় পা দেওয়া...বাবা মা-ভাইবোনদের কাছাকাছি থাকা —এর কোনো তুলনা হয় ? আঃ !!

শালিনী নড়েচড়ে উঠল। ঘোরটা কেটে গেল সোনিয়ার। হালকা লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে ওদের খাটের কাছে গেল, এবং ছোট বোনটির গুটিয়ে-যাওয়া ফ্রকটা টেনে নামিয়ে দিল।

ডাইনিং রুমে বাবা-মা খেতে খেতে কথা বলছিলেন।

"গ্যাস-সিলিনডারটা একবার দেখো তো আনন্দ। ছিপিটা এমন টাইট হয়ে গেছে, কিছুতেই খুলতে পারছি না।"

"খেয়ে নিয়েই দেখছি।"

"ঠিক করে দিতে পারো তো ভালোই। এই গরমে কেরোসিনের উনুনে রাঁধা যায় না।...ওহ্‌হো, জলটা ফুটছে এখনও ; নামিয়ে নি।"

সোনিয়ার মন চাইছিল, বাবা-মার কাছে গিয়ে একটু বসে। কিনতু ছোটদের রাত-জাগা চলবে না—বাবার নিষেধ। অতএব, গুটিগুটি আবার বিছানায় ফিরে আসা, চুপচাপ শুয়ে পড়া, তারপর চোখ বুজে জন্মদিনের উপহার গোণা—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ—ছ'য়ে আর পৌঁছনো হল না, তার আগেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সোনিয়া সিনহা।

* * *

"আহ্‌!"

সোনিয়া তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়।

কেউ কি কেঁদে উঠল ? শনৎ ? শালিনী ? মুখ উঁচিয়ে দেখল—নাতো, আরামে ঘুম যায় দুজনে ! মনটা হালকা হয়ে গেল।...তা'লে বোধহয় কোন খারাপ সপনই দেখছিল !...বুকটা এখনও ধড়াস-ধড়াস করছে। হাতপা গুটিয়ে চোখ বুজে আবার ঘুমোতে যাবে, কানে এসে বাজল মায়ের চিৎকার—

"আনন্দ ! চলে এসো, ছেড়ে দাও ছিপিটা। গ্যাসে আগুন ধরে গেছে। পুড়ে যাবে আনন্দ...আনন্দ !"

"না, মায়া, এটাকে বন্‌ধ করতেই হবে", বাবা বললেন কেমন-যেন চাপা গলায়।

"আগুন যে ! বেরিয়ে এসো আনন্দ...চলে এসো !"

হঠাৎ বাবা হাহাকার করে উঠলেন, "মায়া, সরে যাও,...বাঁচতে চাও তো যাও...যাও...বাচ্চাদের...ওদের—উফ্‌, জ্বলে গেল...জ্বলে গেল !"

সোনিয়া লাফ দিয়ে পড়ল বিছানা থেকে—"বাবা, বাবা !"—বিজলীর গতিতে ছুটে গেল ডাইনিং রুমে।

দেখল—কিচেন থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে মা থরথর কাঁপছেন, ঠোঁটের ওপর ঠেসে-ধরা আঙ্গুলের শাদা শাদা মাথা !...হঠাৎ তিনি এগিয়ে গেলেন দুপা... দরজা দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন বাবা...দু হাত দিয়ে মা জড়িয়ে ধরলেন...লম্বা-চওড়া শরীরের ভার সামলাতে না পেরে টাল খেয়ে পড়লেন।

কিচেন থেকে একঝাঁক আগুন এসে আঁচড়ে দিয়ে গেল সোনিয়ার কচি মুখ।...গ্যাস-সিলিনডারটা আগুনের গোলা...যেকোন সময়ে ফেটে যাবে !

"হাওয়া, হাওয়া চাই", সোনিয়ার চিৎকার, "মা, বেরিয়ে চলো।"

মার হাত-পা যেন চলছে না, বিড়বিড় করে শুধু বললেন, "আনন্দ...আনন্দ কথা বলছে না !"

এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সোনিয়া বাবাকে জাপটে ধরল কাঁধের কাছে। নাকে এসে বিঁধল পোড়া মাংসের বিকট গন্ধ। গা-বমি করে উঠল। বাবার দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল—গোটা মুখটা ঝলসে গেছে. ঘাড়ের চামড়া আগুনের মতো লাল !—"বাবা !"

"টানো, মা, টানো !" কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে হিঁচড়ে নিয়ে চলল কিচেন থেকে, ডাইনিং রুম হয়ে—"বাইরে, বাইরে চলো।"

মার, সোনিয়ার, দম ফুরিয়ে আসছে, হাঁফ ধরছে। গরম হাওয়া হুল ফুটিয়ে চলেছে চোখে, ফুসফুসের ভেতর। টেনে নিয়ে যাওয়ার জোরও ফুরিয়ে এসেছে। তখন দুজনে মিলে অচেতন দেহটা তুলে নিল পিঠের ওপর, ঝুঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল সদর দরজা পেরিয়ে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে, গাড়ি-বারান্দার নীচে, সেখান থেকে খোলা লনে। তারপরেই ওরা লুটিয়ে পড়ল নরম ভিজে ঘাসের ওপর।

"মিসেস সিনহা...মিসেস সিনহা...কী হয়েছে ?"

সোনিয়া মাথা তুলল, চোখ মেলল—পড়শীদের দরদী মুখ।

"কী সাংঘাতিক !" কাছে এগিয়ে এসেই আঁৎকে উঠলেন দুই বুড়ো-বুড়ী, "কী হয়েছে ডাঃ সিনহার ?"

"গ্যাস"—গলা বুজে আসছে মিসেস সিনহার, "গ্যাসে...আমার স্বামী... ওহ্, ভগবান !" বলতে বলতে সাড়হীন দেহটার ওপর আছড়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন : "আনন্দ...আনন্দ !"

"হাসপাতাল...এখুনি নিয়ে যেতে হয়", বুড়ী তাড়া দেন স্বামীকে, "বিনোদ, শীগগির যাও, অ্যাম্বুলেন্স-এ ফোন করে দাও। আমি থাকছি এখানে।" প্রায় দৌড়ে বুড়ো বেরিয়ে যেতেই, ঘুরে, মিসেস সিনহার পিঠে আলতো হাত রেখে মৃদু গলায় বললেন, "কাতর হবেন না ভাই, এখুনি সবকিছু এসে পড়বে।"

আর, ঠিক তখনই সোনিয়ার মনে পড়ল—শালিনী ! শনৎ ! মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ; একটা কথাই বেরিয়ে এলো—"সর্বনাশ !"

চকিতে ও উঠে দাঁড়াল। "শালিনী, শনৎ, ওরা যে বাড়ির ভেতরে!", —চিৎকার করতে করতে দৌড়ল গাড়ীবারান্দা দিয়ে।

"সোনিয়া, দাঁড়াও, যেওনা সোনিয়া"—বুড়ীর নিষেধ ছুটে এল ওর কানে। কিনতু তার আগেই ও পৌছে গেছে সদর দরজায়, টেনে খুলে ফেলেছে ভারী পাল্লা ছুটো।

ভেতর থেকে এক বল্গা গনগনে তাপ ছুটে এসে লোহার থাপ্পড় কষাল ওর মুখে; একরকম হড়কেই ও পিছু হটে এল। সিলিনডারের দাউদাউ আগুনে ঘুপসী রান্নাঘর যেন একটা বিরাট উনুন—পুড়িয়ে বেঁকিয়ে গলিয়ে দিয়ে চলেছে চারপাশের সবকিছু।

'ঝনন্ন্'—সাজিয়ে-রাখা পেয়ালা-পিরিচ-বাসনের গোছা মেঝের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। জানলার শিক ছমড়ে-মুচড়ে পড়ে গেল সিংক্-এ—'দড়াম'! সে-আওয়াজে ডুবে গেল শোবার ঘর থেকে ভেসে-আসা ছুটি আকুলি-বিকুলি কান্না।

শালিনী! শনৎ! ওহ্ ভগবান, ওরা পুড়ছে যে!

মুখ দিয়ে ফুসফুসে অনেকখানি হাওয়া ভরে নিয়ে, দম চেপে, সোনিয়া টেনে খুলে ফেলল দরজাটা, ড্রয়িংরুমের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে পৌঁছল ডাইনিং রুমে।

যা দেখল, ভয়ংকর সে ছবিটা!

টেবিল চেয়ার ফেটে টুকরো টুকরো; সাইডবোর্ডের পাল্লা ছুটো হা-হা করে ঝুলছে কবজার ওপর, শেলফে যাকিছু ছিল, মেঝের ওপর ভেঙে-ভুঙে ছড়ানো-ছিটানো!

ভাপে ঝলসে যাচ্ছে হাত পা মুখ বুক। কপালের ছুপাশের চুল কুঁচকে কুঁকড়ে শেষে মিলিয়ে গেল। ভয়ে, চামড়া-পোড়ার বিচ্ছিরি গন্ধে, মাথা ঘুরতে লাগল। বুকের ভেতর থেকে কে-যেন বলল, "ফিরে চলো, এখনও সময় আছে।" কিনতু মাথায় হাজার হাতুড়ির ঘা: "ভাইটিকে বাঁচাও, বোনটিকে বাঁচাও।"

হোঁচট খেতে খেতে সোনিয়া এগিয়ে চলল, হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল শোবার ঘরে—বিছানার ওপর ছোট ভাইটিকে বুকে চেপে ধরে বসে শালিনী অঝোরে কাঁদছে। ঘামে জবজবে চুল লেপটে গেছে ফুলে-ওঠা লাল মুখের ওপর।

"সোনিয়া, সোনিয়া"—আতুর চিৎকারে শালিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল দিদির কোলে। ওকে ধরতে গিয়ে দারুণ যাতনায় বেঁকে গেল সোনিয়া। সাহস দিয়ে কিছু বলতে গেল, কিনতু গলা শুকিয়ে কাঠ।

বুক ভরে দম নিতে নিতে ডান কাঁখে বোনকে, বুকের ওপর ছোট্ট শনৎকে চেপে ধরল। দুজনেই কাঁপছে, কাঁদছে, বেশি করে বাচচাটা : "ছোনিয়া ! ম্মা ! বাব্বা !"

"শ্শ্শ্—শালিনী ! শনৎ !" হাসি দিয়ে, সাহস দেখিয়ে, ওদের ভয় দূর করতে চাইল সোনিয়া।

ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ল নিজের দিকে—এটা কি হাত না আর কিছু-- এই ফোস্কা আর কাঁচা মাংসের দলা !! ভয় এবার ওকেই জড়িয়ে ধরল ; মনে হল, পা ভেঙে পড়ে যাবে—ঠিক যেমন হয়েছিল বাবাকে বাইরে নিয়ে যাবার সময়ে, একটু আগেই।

এবং একইভাবে আবারো মনে হল : "পারব না, আমি বাইরে যেতে পারব না, তিনজনেই পুড়ে মরব এখানে।" সংগে সংগে ভেতর থেকে আবার সেই তাগিদ : "পারবে, তুমি পারবে সোনিয়া। চলো, চলো, এগিয়ে চলো সামনে।"

এবং সোনিয়া এগিয়ে চলল !

পা-দুটো যেন কঠিন কাঠের তৈরি। তার ওপর কোলে-কাঁখে ভাই-বোন, তাদের ভার। কোন রকমে টেনে-হেঁচড়ে-ঘষড়াতে-ঘষড়াতে, তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে, শেষে চোখ বুজে দৌড়...এক ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পেছনে, শেলফটা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে। সে-আওয়াজে আরও ঘাবড়ে গেল ও। দমচাপা ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে। পা যেন ভারী সিসে ! পারবে না, সদরদরজায় ও পৌঁছতে পারবে না, কোনদিনই না।

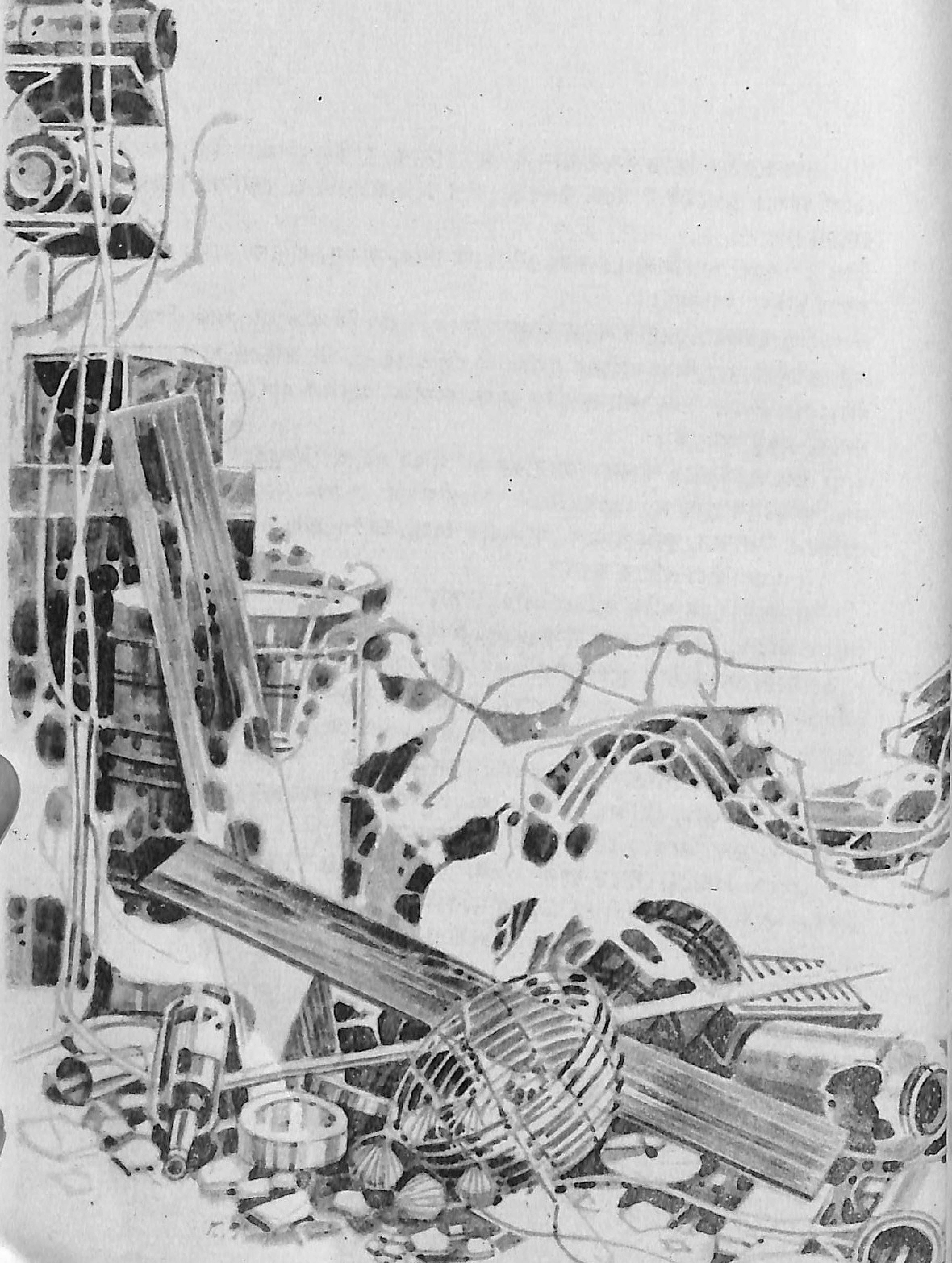
"পারবে তুমি, সোনিয়া, পারবে, খু-ব পারবে"—জবাব এল ভেতর থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে ঠেলে নিয়ে চলল সোনিয়া।

এবং একসময়ে পৌঁছে গেল সদরে, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা দুটো। মাথা না তুলে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কোনরকমে এসে পৌঁছল সিঁড়ি অবধি, হুমড়ি খেয়ে নামতে নামতে তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল কান্নার সাগরে : "মা, মাগো, পুড়ে গেলাম, আমি পুড়ে গেলাম !"

পা ভেঙে পড়ে গেল সোনিয়া, তারপর তলিয়ে গেল কোন্-এক তলহীন আলোবিহীন গভীর শূন্যতায়।

* * *

"কথা বলবে না !"





হাসপাতালের বেডে শায়িতা মেয়েটির কালো চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু নরম করে বললেন : "তুমি ভালো আছো।"

"আমার মা কোথায় ? আমার বাবা ?...শালিনী ?...শনৎ ?"

"তোমার মা, ভাই, বোন ভালো আছে।"

"তো, আমি এখানে কেন ?...এতো ব্যান্ডেজ কিসের ?...উফ্, লাগছে... আমার মুখ...আমার মুখ .."

গভীর মমতায় ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে শোনালেন : "সোনা মেয়ে! তোমার খুব অসুখ করেছিল...আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ঘাড় হাত মুখ।...সেতো বাইরেকার ব্যাপার। ভেতরে-ভেতরে তুমি সেই সোনিয়াই আছো, সাহসে ভালবাসায় ঝকমকে সেই অসাধারণ মেয়ে, ভাইটিকে-বোনটিকে যে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিল মরণের মুখ থেকে!...দু-একটা শাদা-কালো দাগের কথা ভেবে ভয় পাবার মেয়ে সে নয়—এ আমি ভালো করেই জানি!...কি বলো, সোনিয়া, ভয় পাবে ?"

সোনিয়া তাকাল ডাক্তারবাবুর দিকে। দুচোখের কানায়-কানায় উথাল-মাতাল অনেক জল!...অনেকটা সময় নিল ও!...তারপর ধীর মৃদু সহজ গলায় জবাব দিল : "না, একদম না!"



মরণ যেন হেঁটে গেল

শতরুঘনের গভীর কপিশ চোখ উৎসাহে চিকচিক করে উঠল। হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলল : "ওহ্‌হ্‌, দারুণ!...নাটক আমি যা ভালবাসি না!...একদিন আমিই সাজব মহাভারতের অর্জুন!" তারপর বুক চিতিয়ে উঁচু গলায় সংলাপ আওড়াল : "হে কৃষণজী! হে অজর অমর অব্যয়! চালিত করো মোর রথ ওই হোথা, বীর সেনানীগণ যেথা মুখোমুখী লড়াকু দুশমনের!"

শাড়ীর আঁচলের আড়ালে খিলখিলিয়ে উঠল রমণীরা, বাচ্চারা ফেটে পড়ল তুবড়ি-হাসিতে। মজার চোটে শতরুঘনকে নকল করল : "এ্যয় জলাবিহীন কিসেনজী! চলো, চলো, লিয়ে চলো মোর লথ ওই হোথা..."

মাবাপহারা বারো বছরের বালকটিকে সব্বাই ভালবাসত। বছর কয়েক আগে এখানে এসেছে চাচার কাছে থাকবে বলে। সব সময়েই হাসি-ঠাট্টা-মজা, সব কাজেই হাত বাড়িয়েই আছে। ফলে, রোগা-পাতলা ছেলেটি সহজেই কেলাবাড়ি গাঁয়ের ছোট-বড় সকলের আপনজন হয়ে গিয়েছিল।

"ঠিক আচে শতরুঘন বেটা, তোকে লিয়ে যাব মোদের সাথ। সাঁঝের পেরথম বেলাতেই মোরা বেরিয়ে পড়ব—যা" : কথায় হাসি মিশিয়ে দিলেন চিতন দেবী, বয়সে সবচেয়ে বড়ো এখানকার মহিলা-মহলে।

খুশির দমকে লাফিয়ে উঠল শতরুঘন, লাফাতে লাফাতেই ছুট দিল ঘর-মুখো।...

চড়া স্বরে গান গাইতে গাইতে শিস দিতে দিতে চান শেষ করল শতরুঘন লাল সাহু; কাচা পাটকরা জামা-প্যাণ্ট পরল; তারপর ধোঁয়া-ধোঁয়া কালচে রসুইঘরে পেতলের থালির সামনে উবু হয়ে বসে হাপুসহুপুস খাবার গিলতে লাগল।

"ধীরে, শতরুঘন বেটা, ধীরেসে খানা।"

ধীরে খাওয়া ?—সাহুজীর ধাতেই নেই ! তার ওপর, ওর অতি পেয়ারের মটর-ভাত—সে-কি চিবিয়ে-চিবিয়ে খাওয়া যায় ? অতএব, মিনিটে থালা খালি ; ঠোঁট, আঙ্গুলের মাথা, সব চেটেপুটে সাফ ; লোটা ভরা জল। শেষবেশ এক গর্জন : "কী বড়িয়া খানাই না আজ বানিয়েচো, চাচী ! আঃ !! এট্টু বেশিই বোধয় চালান করে ফেলেচি।"

"ঈ আর লতুন কথা কী !" চাচীর মুখে খুশির হাসি।

"আজ কিনতুক বেশি খাওয়াটা খুব জরুরী ছিল। কেন জানো চাচী ? মহাভারত দেখতে মোরাসব ভাটায় চলচি, কাল সবেরে ফিরব।...চিতন দেবী লিয়ে চলেচেন মোদেরকে—হাঁ।"

"সিতো ভালো কথা শত্রুঘন।...সাবধানে যাবি আসবি।...আর হাঁ, শয়তানী করবিক নে।"

"থাকব, চাচী, থাকব...করব নি, চাচী, করব নি", বলেই মিটিমিটি হেসে আলতো জুড়ে দিল, "ঈ আর লতুন কথা কী !" তারপরেই এক ছুটে ঘরের বাইরে। মাথা হেলাল চাচী, মুখে হাসি, আদর মাখানো। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বড় শাস।

চারজন নারী, ছ'জন কচিকাঁচা। যখন পথে নামল, সূরজদেব ঢলে পড়েছে আকাশের এক পাশে। সরু পথ, দুপাশে ছোট ছোট ঝোপ, তারপর ধূ-ধূ মাঠ। তার ওপর নেমে এল রাতের কালো ছায়া একটু একটু করে। নভেমবরের ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল নাকের ডগাগুলো।

"জাড়া এসে গেল", চিতন দেবীর কথায় সায় দিয়ে রমণীরা কাঁধের ওপর শালগুলো টেনে জড়িয়ে নিল। ছোটকু-নির্মলের হাত ধরে শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলল শত্রুঘন।

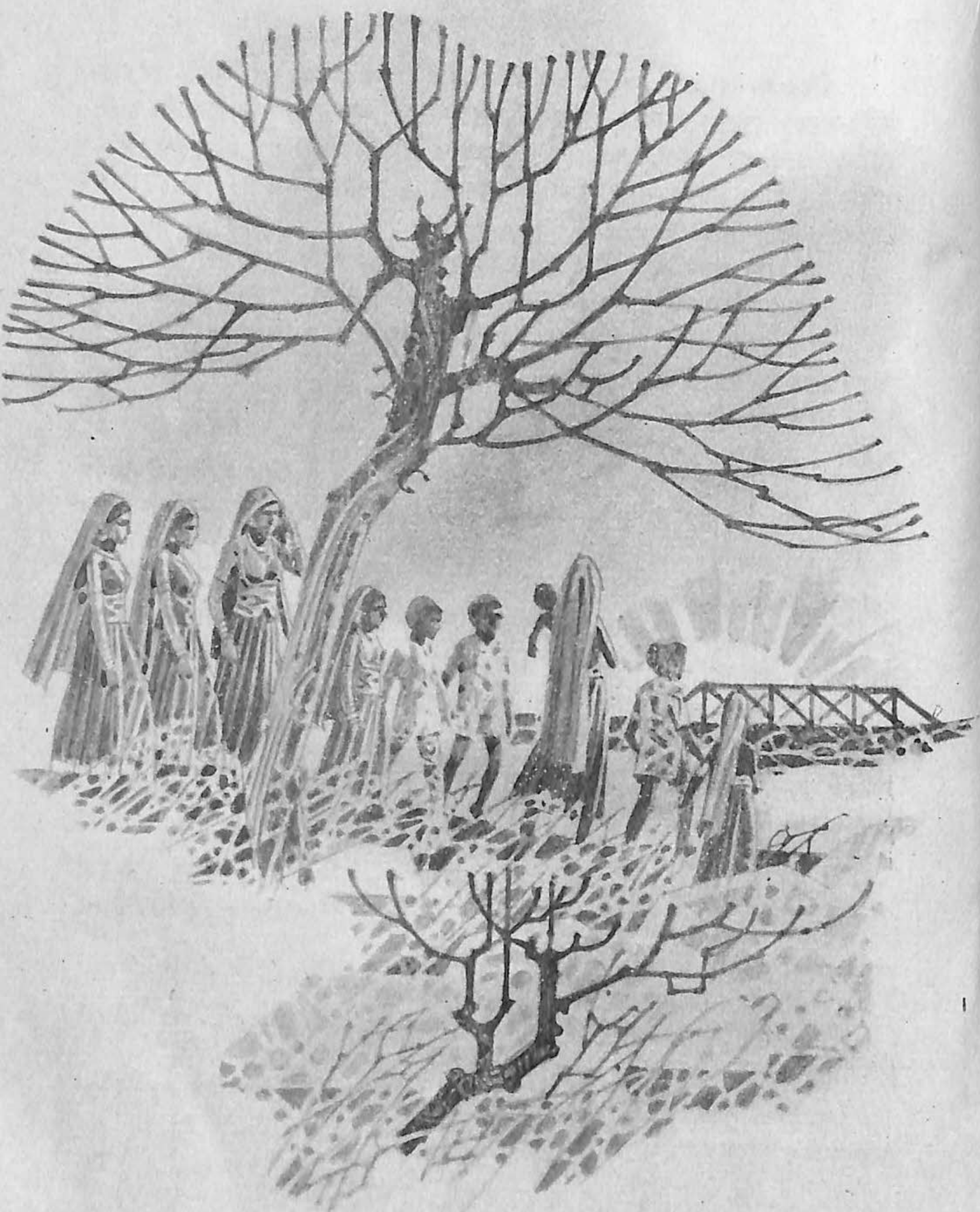
সামনেই রেল লাইন। ভিলাই থেকে আসছে।

চিতন দেবী বললেন, "এই লাইন ধরেই আগানো যাক। ফুলঝর নালা পার হওয়া আসান ঈদিক থেকে।"

"আসান...কিনতুক লিরাপদ কি ?" শত্রুঘন শুধোয়।

"সড়কের থিকা লিরাপদ। কোনো গাড়িও আসে না ঈসময়।...পা চালিয়ে চলো গো সবাই, তাড়াতাড়ি পৌঁচতি হবেক।"

নারী ও শিশুদের রেল-পথে তুলে নিল শত্রুঘন ; আবার নির্মলের হাত ধরে আগে আগে চলতে থাকল।



মোটা কমবলের মতো রাত। পায়ের নীচে কিছু নজরে পড়ছে না, শুধু আন্দাজ করে করে এগোনো। ঠাওর করে শত্রুঘন বুঝে নিল, কতোখানি তফাতে পা ফেলতে হবে; কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হাঁটাটা তখন আর তেমন কঠিন মনে হল না।

"একটু চেপে চলো না মা, আমি-যে অতো জলদী হাঁটতে লারচি"—পেছন থেকে ছোটদের একজনের কাঁদো-কাঁদো গলা শোনা গেল। চিতন দেবীর কোলে খুদে বাবলি কাতরে উঠল।

"চু-প, কাঁদে না", চিতন দেবী থাবাড়ী দিলেন, "আমরা এই পৌঁচে গেলাম বলে।...হাঁ, তোমরা শকুন্তলার কহানী জানো?"

"খু-ব জানি, কম-সে-কম শ'বার শুনেচি"—ওঁকে একটু খেপাতেই যেন বলল শত্রুঘন।

কিনতু চিতন দেবী দমে যাবার মানুষ নন: "ঠিক আচে—যারা জানে না, তারা তবে শুনুক শকুন্তলার কহানী...আর, যারা শ'বার শুনেচ্ছে, তারাও!"

যেন একটুও মজা নেই, এইরকম একটা ভাব নিয়ে বারকতক গাঁইগুঁই করল শত্রুঘন। কিনতু চিতন দেবী যখন রাজা ও শকুন্তলার সুখ-দুঃখের বয়ান দিতে লাগলেন, সবকিছু ভুলে গিয়ে ও একমনে শুনতে লাগল।

বাকিরা তো সকলেই চুপ! কথা বলছেন শুধু চিতন দেবী।

হঠাৎ শত্রুঘন দাঁড়িয়ে পড়ল—রেলের সড়কটা একটু কেঁপে উঠল না? ভুরু কুঁচকে সামনের আঁধারকালো ভেদ করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল: "শ্‌শ্‌শ্‌! একটা গাড়ি আসচে না?"

"রেলগাড়ি...লেলগাড়ি", ছোটরা কলরব করে উঠল।

"আঃ, বাজে শোরগোল করচো সব," ধমক দিলেন চিতন দেবী, "এহেন কালে এখেন দে' কোনো টেরেন কদাপি যায়নি আর যাবেও না।...শয়তানী রাখ শত্রু...ছোটদের ডরাস নে এভাবে।...লখ্‌খীটি, কথায় বাগড়া দিস না! হাঁ, কোথায় যেন ছিলুম?—ওহ, হাঁ, শকুন্তলা কাঁদচিল......"

শত্রুঘন কাঁধ দুটো ঝাঁকাল। হয়তো চিতন দেবীই ঠিক। রাত আটটায় এ-লাইনে টেরেন আসতে ও-ও কখনো শোনে নি।

অতএব শকুন্তলা চলল বাপের বাড়ি ছেড়ে। ওরাও পৌঁছে গেল ফুলঝর নালার পোলে। লোহার রেলিঙের ফাঁক গলে, শিস ও গর্জন তুলে একঝাঁক দমকা বাতাস ছুটে এসে ঝটকা মারল ওদের চুলে, ঠাণ্ডা আংগুল দিয়ে খোঁচা

মারল খোলা মুখে। চিতন দেবী সাবধান করে দিলেন, "সবাই কাচাকাচি থাকো।" বাতাস তুলে নিয়ে গেল কথাগুলো। নির্মল কাঁপতে কাঁপতে শত্‌রুঘনের হাত আরও জোরে জড়িয়ে ধরল।

নারী ও শিশুর ছোট দলটিকে নিয়ে চিতন দেবী পোলের ওপরে উঠলেন। "জলদী, জলদী" : কোরাস আওয়াজ উঠল। তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে একরকম দৌড়েই দলটা এগিয়ে চলল শত্‌রুঘনকে সামনে রেখে। পোলের মাঝামাঝি পৌছেছে, আর একবার কেঁপে উঠল রেলের লাইন।

"পুলটা দোলে যে", রমণীদের একজন বলল।

"মা, মা, পুলটা ভেংগে পড়চে!" ভয় পেয়েছে একটি মেয়ে।

"ফির বাজে কথা?" হাওয়ার মুখে কথা ছুঁড়ে দিলেন চিতন দেবী। "বাতাস, ওটা বাতাসে করছে। পা চালিয়ে। জলদী!"

শত্‌রুঘন কান খাড়া করল—পিছনের ওই আওয়াজটা রেলগাড়ির না? অথবা, সামনের দিক থেকে আসচে ওটা? আঁধারের মাঝ দিয়ে আর-একবার নজর চালিয়ে দিল, কিছুই দেখতে পেল না। শুধু এক ঝলক বাতাস চাবুক মেরে গেল মুখের ওপর!

আর তখনই মনে হল : আসচে, কিচু একটা আসচে! রাতের ডানায় ভর করে একটা-কিচু ছুটে আসচে, বাতাসের গায়ে টের পায় শত্‌রুঘন। এদিকেই এগিয়ে আসচে—আ, টেরেন! একটা টেরেন...রেলগাড়ি!!—ও ঠিকই ধরেছিল।

"নির্মল!...চিতন দেবী—ভাগো, ভাগো...ছুট্‌!"

কিনতু সে সময়টুকুই বা কোথায়! সামনেই ইস্‌টিম-ইনজিন, পঁচাশ গজও হবে না। সবাই চাপা পড়বেক, কেউ বাঁচবেক নি!—ও বেশ অনুভব করতে পারছে ইনজিনটাকে, অনুমান করতে পারছে, নজরে আনতে পারছে না। আলোও নেই—ভুতুড়ে গাড়ি যেন!

"লাফ মারো, লাফ মারো সবাই!"

দুহাতে নির্মলকে উঠিয়ে নিয়ে শত্‌রুঘন লাফ দিল রেললাইনের ওপর থেকে, গিয়ে পড়ল পোলের ধারে লোহার রেলিঙের ওপর—ওগুলো তখন থরথর কাঁপছে। ডানদিকে মুখ ফেরাতেই দেখল : আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ইনজিনটার বিকট কালো ঘন ছায়াশরীর...হিস্‌হিস্‌ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে!

একবার মনে হল, চিতন দেবীর গলা শুনল যেন ! এক লহমা শুধু। পরখনেই ইনজিনের বিকট আওয়াজ সবকিছু গিলে ফেলল এক গেরাসে।

"বাঁচাও, ভগওয়ান, বাঁচাও"—দুহাতের ঘেরে কেঁপে-কেঁপে ওঠা বাচ্চা মেয়েটাকে পিষে ফেলতে ফেলতে লোহার ঠাণডা রেলিং আঁকড়ে ধরল শত্রুঘন ছুটে-যাওয়া ইনজিনের একটা প্রবল হলকা ওকে ফেলেই দিয়েছিল আর একটু হলে !...

ভূতের মতো যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেল ইনজিনটা চারদিক আবার তেমনি চুপ হয়ে গেল। চুপচাপ—কেমন-যেন গা-ছমছমে ভয়-পাওয়ানো !

কেউ কোন কথা বলছে না কেন ?

নির্মল ডাকল, "মা, মা !"—জবাব এল না।

শত্রুঘন আশা করছিল, এই বুঝি চিতন দেবী শুরু করলেন গাল দিতে—ইনজিনকে, ড্রেরাইভারকে, হয়তো দুজনকেই ! কিন্তু একটা কথাও কোথাও বেজে উঠল না। আঁধার-রাত তেমনি নিরব, নিথর, থমথমে !

"চিতন দেবী, বাবলি, সুক্কু বাঈ..." এক এক করে নাম ধরে ডাকল শত্রুঘন। একজনও সাড়া দিল না।

এবার ভয় ঢুকল মনে—কী হল ! কোথায় গেল সবাই ?

হঠাৎ একটা আওয়াজ, খুব মৃদু, ওর কানে এল—একটা গোঙানি !

"বাবলি !"

গোঙানিটা বাড়ছে...বাড়তে বাড়তে কান্না...চিৎকৃত কান্না।

"বাবলি কাঁদচে !" আঁধারে মুখ রেখে ও শুধোল, "কোথা তুই ?"

শত্রুঘনের বুকে মুখ চেপে ধরে নির্মল ককিয়ে উঠল, "ঘর যাবো !"

"যাবো বইকি নির্মল, ঘরকেই যাবো", কোনরকমে সহজ সুরে বলল শত্রুঘন, "তার আগে দেকি, বাকী সবাই কোথায় !" ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠে এল রেললাইনের ওপর। পাটাতনের ওপর পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল বাচ্চার আওয়াজ অনুসরণ করে। আতংকে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে।

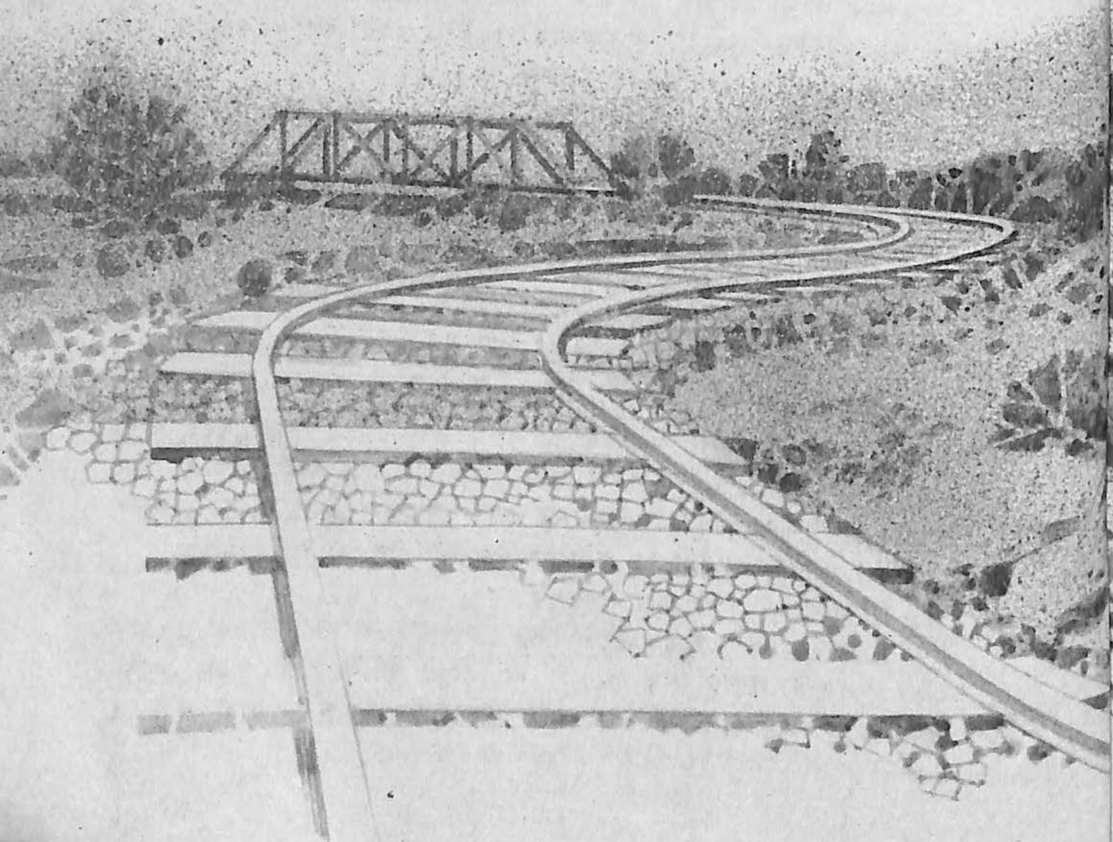
নীচু গলায় ডাকল, "বাবলি, বাবলি !"

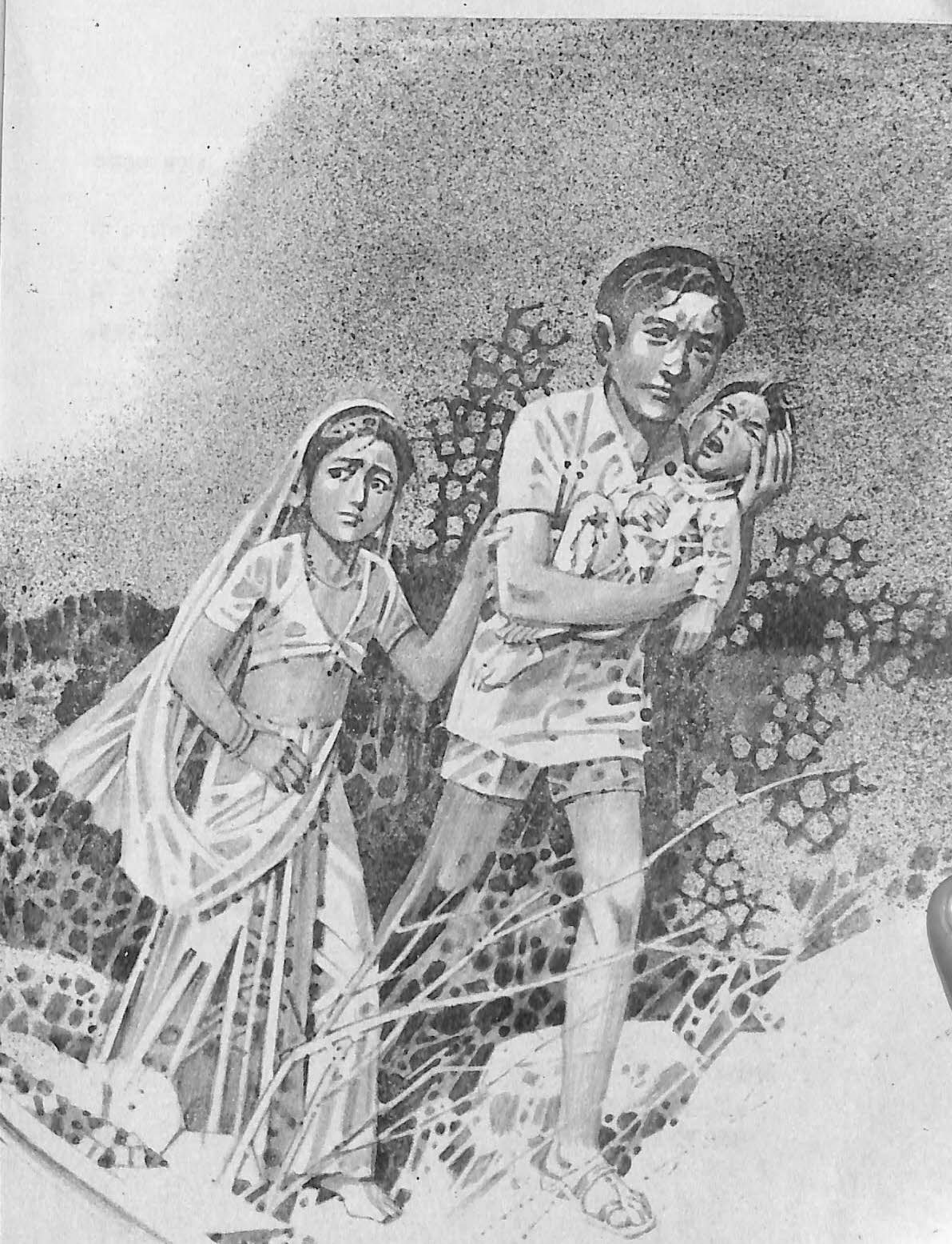
"এ্যাঁ, এটা কী ?" পায়ে একটা-কিছু ঠেকে গড়িয়ে পড়তেই চমকে উঠল শত্রুঘন। পাদুটো পাথর হয়ে গেল ! না, হেরে গেলে চলবে না, ওদের বাঁচাতেই হবে ! ..নীচু হয়ে পাটাতন এবং পাথরকুঁচি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে থাকে

সাবধানে। কয়েক কদম যেতেই হাতে ঠেকল একটি শিশুর দেহ, এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে। আলতো উঠিয়ে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরল : "বাবলি, বাবলি!" কাতরে উঠল বাচ্চাটা। চুপ করাতে পিঠে হাত রাখল—একটা বড় জখম, খুন চুঁইয়ে পড়ছে।

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল শতরুঘনের। জোর করে সামলে নিল। এখুনি ওকে গাঁয়ে ফিরতে হবে। একটুও দেরি করা চলবে না। তবু...তবু ও যেতে পারল না। কালো রাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও আর-একবার, শেষবার ডাকল : "চিতন দেবী, স্কুু বাঈ...চিতন দেবী!"

বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে গেল নামগুলো, কোনো জবাব নিয়ে এল না। ভয়ার্ত গলায় শতরুঘন বলল : "আয় নির্মল, আমার হাত ধর।...লোকজন ডেকে





এনে আবার খোঁজ করতে হবে।" যদিও মনে-মনে বুঝে গিয়েছিল, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ঘুরে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল আঁধার ঠেলে ঠেলে। সবচেয়ে কাছের গাঁ —মুংরী সেই দিকেই মুখ ক'রে।...রেললাইন ছেড়ে নেমে এল সড়কের খোঁজে। নির্মলের হাত চেপে ধরে আহত শিশুকে বুকে ঠেসে আঁধার হাতড়ে-হাতড়ে ও এগিয়ে চলল। দুপাশের ডালপালা মুখের ওপর ঝাপটা মারে, বাহুতে খোঁচা দেয়, পা জড়িয়ে ধরে। মুখ থুবড়ে পড়ে ও, তার টানে নির্মলও পড়ে যায়।

"কিচু না, নির্মল, ও কিচু না"—নিজেকে, ভয়তরাসে মেয়েটিকে টেনে তুলে আবার এগোতে থাকে।

একটা প্যাচা ডেকে উঠল খনখনে গলায়! ধড়াস করে উঠল শত্রুঘনের বুকটা! রাত যে এতো কালো, এমন ভয়ানক ও ভয়ধরানো হতে পারে, ও জানত না, ওর জানা ছিল না!

একজোড়া নরম কালো পাখায় ভর করে কী-যেন একটা ভেসে গেল পাশ দিয়ে! শত্রুঘনের হাতপা যেন ভেতরে ঢুকে গেল। মনেমনে বলল, "বা... বাদুড়...একটা বাদুড়ই হবে!" উঁচু উঁচু ঘাস, তার মধ্যে সড়সড়ে আওয়াজ! চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পাতল—আঁধারের বুকে কতোসব বিদঘুটে আওয়াজ: শেয়ালের ডাক, হায়নার হাসি, আরও কতো কী! কোণে কোণে ওৎ পেতে আছে অজানা বিপদ: বিষভরা সাপ, যম-বিছে, বুনো কুকুর, এমনকি বাঘ-নেকড়েও!...

এক ঝটকায় ভাবনাগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল শত্রুঘন দুবলা নিকম্মা করে দেয় এমন কিছুই সে ভাববে না। মুংরিতে ওকে পৌঁছতেই হবে।

এবং পৌঁছলও শেষতক, বেদম হয়ে, ঠোক্কর খেতে খেতে। সামনে যে কুটিরটা আগে পড়ল, তার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল: "বাঁচাও...বাঁচাও... ডাকতার...বাচ্চা মরে যায়...!"

দেখতে দেখতে গোটা গাঁ ওদের ঘিরে ধরল।

"কী, কী হয়েচে, বেটা?"

"খুনে মাখামাখি একেবারে! চোট লেগেচে?"

"মোর না—এই বাচ্চাটার। ওকে বাঁচান...জলদী!"

"কুথায় হলো এ্যামনটা?"

"মোরা ছিলম দশজন...এখন—তিনজন। কী যে হল, জানি না !...খুন ...উফ্, এ্যাতো খুন !...ওরা সবাই...সবাইই হয়তো...ওহ্ হো—" কথা শেষ হবার আগেই শত্রুঘন কাটা গাছের মতো ভেংগে পড়ল গাঁও-মোড়লের দু'হাতের ওপর...ডুবে গেল, হারিয়ে গেল...তালতাল আঁধারের অতলে !

* * *

রেললাইন ধরে মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের দিকে এগিয়ে চলল গোটা মুংরি গাঁ। কারও মুখে কথা নেই। শুধু কানে বাজছিল কিশোরটির এলোমেলো কথাগুলো : 'দশজন...তিনজন...এ্যাতো খুন !'

ফুলঝর পোলে পৌঁছে লণ্ঠন তুলে ধরল ওরা। যা দেখল, শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল !—রেললাইন ও পাটাতনের মাঝে রক্তের পুকুর...ছেঁড়াখোঁড়া সাতটি মৃতদেহ...নারী ও শিশুর !!

লণ্ঠন নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সবাই।

অবশেষে, গাঁও-মোড়লের মুখে কথা ফুটল : "ঈটা কিভাবে হলো ?... ইনজিনের বাঁশি শোনো নাই, বেটা ?"

"বাঁশি তো বাজায় নি।...বাতিও ছেল না।"

"বাতিটা বোধয় খারাব ছেল !"

"এ্যাট্টা ইনজিন, খারাব বাতি"—কে-একজন বলল আপনমনে— "এ্যাট্টা সাধারণ ছোটো গড়বড়ি, তা থিকা এ্যাতো বড়ো বিপদ !"

"এটা বোধয় শাট্‌ল্ ছেল, টিশন থিকা ভিন্ টিশনে দৌড় দেছিল এ্যাট্টা কানা দানোর মতো !"—আরেকজন বলল।

"ইনজিনের আওয়াজ পাও নাই ? শোনার তো কথা !"

"পেয়েচিলম...আররা পায় নি ; অথবা য্যাখোন পেল, তখোন অনেক দেরি হয়ে গ্যাচে।" দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল শত্রুঘন।

"বেটা, কাঁদে না। তোমার তো গলতি নয়। য্যাতোটা পারা যায়, করেচো...মোরা যা পারতুম, তার চে' বেশি করেচো।" বাঁদিকে দাঁড়ানো লোকটির দিকে ফিরে মোড়ল বললেন, "বাহাদুরলাল, একে ঘর নে' যাও।... যাও বেটা, ভগওয়ান তুমায় সাথ দিন।"

ফিরে চলল শত্রুঘন বাহাদুরলালের সাথে—মুংরিতে, নিরবে। মরণ যেন হেঁটে গেল ওদের মাঝখান দিয়ে !!

দয়াময়ী মেরী, আমাদের বাঁচাও

সেই দিনটার কথা আমি ভুলব না—1965 সালের 22 ফেবরুয়ারী, শনিবার—কোনদিনই ভুলব না। পনেরো বছর হয়ে গেছে, তবু আজও আমার কানের পাশে বেজে ওঠে মরণ-কবলিত মানুষগুলির শেষ আর্তনাদ, অসহায় শিশুদের করুণ কান্না, আর বাতাসের ভয়ংকর গর্জন, আর থরথর-ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ওদের শেষ প্রার্থনা : "হে মেরী, হে দেব-মাতা, দয়া করো আমাদের, কৃপা করো।"

শেষ দিন অবধি আমার মনে থাকবে তাঁর সেই ভয়-পাওয়া চোখের চাহনি, মা যখন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে একটা শিশুর মতো দোলাতে দোলাতে দেখছিলেন আমাকে : "ফেলিসিটাস, আমার সোনামেয়ে! প্রভু দয়াময়, যিনি তোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে!...দয়াময়ী মেরী, তুমি শুনেছো আমার মিনতি, জয় হোক, তোমার জয় হোক!"

এর পরে আমি আর থাকতে পারলাম না, ঠিক সেইটেই করলাম, যা করতে চেয়েছিলাম আপৎকালে—মায়ের কাঁধে মুখ চেপে কেঁদে ফেললাম। মা হাঁটু গেড়ে বসে আমার পায়ে তেল ঢেলে দিলেন—মরণের মুখ থেকে কেউ বেঁচে ফিরে এলে এটাই করণীয় রীত উড়িষ্যার এই সুন্দর গাঁ ঝুঁমীর-এ।

* * *

"এসো, মা"—মা একটি চুমু এঁকে দিলেন আমার কপালে। বললেন : "তুই তো জানিস, আমারও মন চাইছে যেতে। কিনতু ছোটগুলোকে কার কাছে রেখে যাব? তাছাড়া, খেতের কাজ আছে, তোর বাবার পাশে থাকতে হবে।...আয় মা! সদাপ্রভু তোর সহায় হোন, তাঁর প্রেম ঘিরে থাকুক তোকে সবদিকে।"

"আসি, মা!"...আমার খুব ইচ্ছে করছিল, মাও চলুক আমাদের সংগে। কতোইবা দূর কেসেরাল গাঁ? নদীপথে সবে তো মাইল পাঁচেক!...আজ কিনতু ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আসতে পারেন নি ব'লে!

"হাই ফেলিসি!" পেছন থেকে একটা চেনা গলার ডাক শুনতে পেলাম। "আজ এতো সেজেছিস কেন রে?

হুঁ—ফিলোমিনা! ও ছাড়া আর কেউ নয়!

ফিলোমিনাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম আমি।...চাইলাম তো, কাজটা কিনতু খুব সহজ নয়, বলা উচিত, অসম্ভব। যেহেতু, ফিলো আমার প্রিয় সখী, সবচেয়ে বড়ো বনধু।

"এই ফেলিসি!" ব'লেই ও আমাকে ঘুরিয়ে নিল ব্রিজের দিকে: "আ—কমলা রঙের শাড়িতে তোকে কী সুন্দর দেখায় না! ব্লাউজটাও দারুণ ম্যাচিং রে! আরে, আরে, নতুন দুল পরেছিস! খাঁটি রূপোর, না?" দুলজোড়ায় টুসকি দিতে দিতে খুশিতে উপছে ওঠে ও!...রাগ-রাগ ভাব দেখিয়ে আমি ওর আংগুলের ডগা টিপে দিলাম: "ছেলেমান্সী করিস না, ফিলো; ষোলয় পা দিয়েছিস, ছোটটি আর ন'স্।" পরখনেই আমরা দুজনে যেভাবে উছলে উঠলাম, ষোল বছরের যুবতীদের মানায় না!...

"এই, দৌড় লাগা, নৌকো ছেড়ে দেবে—"

পিঠের ওপর বিনুনীর ঝাপটানি, দুহাতে কাঁচের চুড়ির রিনঠিনঠিন—শাড়ি সামলে দুজনে এক ছুটে নেমে গেলাম খেয়াঘাটে। দাঁড়টানা বড় নৌকোটা তীর ছেড়ে নেমে পড়েছে জলে। লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম!..."বিদায় গ্রামবাসী! সোমবার আবার দেখা হবে"—তীরের দিকে চেয়ে হাত নাড়াতে লাগলাম সবাই। ...অবশেষে একসময়ে লোকজন, ঘর-জমি চোখের আড়ালে চলে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম কেসেরালের দিকে—আমাদের আদরণীয়া দেব-মাতা মহিমময়ী মেরীর নামে আয়োজিত জুলুসে যোগ দিতে।

নদীর দুপাশে খেতভরা ধানের শিষ আর তাজা তালগাছ; তাদের দেহে আদরের হাত বুলিয়ে চলেছে উড়ুক্কু বাতাস। ঢলে পড়া তপনদেব দিগন্তকে রাঙিয়ে দিয়েছে কমলা-রঙে। সবুজ জল কেটে তরতর এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকো। নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে মোট নব্বুই জন—করজোড়ে প্রভুর আরাধনা ও মহিমা গান করছে। ফিলো এবং আমিও গলা মিলিয়ে দিলাম।

নদীর ওপারে গাছগুলো কালো হয়ে গেল, তাদের পেছন থেকে উঠে এল রাতের যবনিকা। —রাতেরই কি?...জবাবের আশায় তাকালাম হাল-ধরে-থাকা নেয়ের দিকে—শক্ত-সমথ্থ বুড়ো লোকটি ভুরু কুঁচকে আকাশের মেজাজ বুঝতে চাইছিল।...হঠাৎ এক-দমক কনকনে বাতাস বয়ে গেল জলের ওপর ছোট ছোট



ঢেউ তুলে দিয়ে। নৌকোটা জোর গোঁত্তা খেল একটা। বাচ্চারা কেঁদে উঠল ভয়ের তাড়সে।

"ও কিছু না, কিছু না! চুপ ক'রে বসো সবাই"। মাঝি-মাল্লারা চেঁচিয়ে জানান দিল। কিনতু ওরা যে ঠিক বলছে না, তা জানিয়ে দিল জংগলের পেছন থেকে ছুটে-আসা ভয়ংকর কালো মেঘের দল! দেখতে-দেখতে আকাশ ছেয়ে ফেলল ওরা!

নদীর চেহারা বদলে গেল। বড়-বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল তক্তার ওপর, নৌকো দুলতে লাগল টালমাটাল। শিশুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। পুরুষদের ভীত চোখ দূর তীরের দিকে। আমরা নদীর ঠিক মাঝ-দরিয়ায়!

"আমি সাঁতার জানিনা রে"—ফিরে তাকালাম ফিলোমিনার দিকে: মুখ ছাই হয়ে গেছে!...সাঁতার আমি জানি; আরও কয়েকজন জানে; অনেকেই জানে না। শীতুলীর মতো একটা ভয়ের ব্যথা সড়্সড়্ নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমাদের মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো "হে প্রভু, হে পিতা...।" প্রার্থনা গিয়ে বাজল কালো-হয়ে-যাওয়া আকাশের বুকে, পলকে মিলিয়ে গেল বাতাসের রাগী গর্জনে।

বুড়ো নেয়ে তাগিদ দিল, "তাড়াতাড়ি, হেইসব, আরও তাড়াতাড়ি। ঝড় উঠচে! মোদের লাগাল পাবার আগেই ওপার ছুঁয়ে ফেল্তি হবে।"

চাপা থমথমে মুখে নওজোয়ান মাঝিরা ঝুঁকে পড়ল দাঁড়ের ওপর; গায়ে যতো জোর আছে তাই দিয়ে দিল টান—ছপ্ছপ্, ছপ্ছপ্।

নৌকোর তলা ফুটো হয়ে গেল, জল ঢুকতে লাগল হু-হু করে।

"মেরী, যিশুমাতা, মোদের তরে দুয়া করো।"

হঠাৎ একটা শাদা আলোর চোখধাঁধানো ঝিকিমিকি; আগুন ঠিকরে পড়ল দুরন্ত জলরাশির ফেনিল দেহে!

"মেরী, যীশুমাতা, জগৎ-জননী গো..."

বুড়ো নেয়ের গলা ফুলে উঠল, "দাঁড় টানো, দাঁড় টানো, জোরে, ভাইসব, আরও জোরে।" একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আমরা ভগবানের নাম জপ করতে থাকলাম।

ঝড় এসে পড়ল; নদী ককিয়ে উঠল; জল ঘুরতে লাগল; ঘূর্ণী জলে নৌকো অসহায়ভাবে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল। আচমকা এক-বল্গা বাতাস পাশ থেকে নৌকোয় এতো জোরে ধাক্কা মারল, আমরা সীট থেকে ছিটকে

পড়লাম এ-ওর ঘাড়ে! চিৎকার-চেঁচামেচি-হুটোপাটি। তলায় বাচ্চাগুলো চেপটে পিষে যেতে লাগল। আমার মুখে এসে পড়ল কনুইয়ের একটা গুঁতো, পাঁজরে হাঁটুর আরেকটা।

"ফেলিসি, ফেলিসি!"—ফিলোকে ধরতে আমি হাত বাড়ালাম। পারলাম না। চড়াৎ করে ফেটে গিয়ে নৌকোটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল; সবাই গিয়ে পড়লাম উথাল-মাতাল জলে! এক-দংগল ঠাণডা জল আমাকে জড়িয়ে ধরে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে টেনে নিয়ে চলল পাতালের দিকে। কোন্‌টা হাত, কোন্‌টা পা, ঠাওর করে নিয়ে ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছি, একটা হাত এগিয়ে এসে আমার হাত ছুঁল, ধরবার আগেই পিছলে সরে গেল, তারপর হারিয়ে গেল কোন্ অজানায়।...ফিলো! ফিলো!

মনে হল, ফুসফুস যেন ফেটে যাবে! হাঁফাতে হাঁফাতে কোনরকমে ভেসে উঠলাম। চারপাশে পুরুষ-নারী-শিশু হাঁকুপাকু করছে বাঁচার আশায়, বাতাসে তাদের ভয়ার্ত চিৎকার। নৌকোর তক্‌তা-ধরা হাত—আঁকড়ে আছে, পিছলে যায়, আবার ধরে, পড়ে যায়, এ ওকে ধাক্কা দেয় এতোটুকু দয়া-মায়া না ক'রে; যে যেখানে যেভাবে পারে, ঝুলে থাকার প্রয়াস করছে। কিনতু কতোখ্‌খন? ছপাৎ করে একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে গেল নৌকোটা, চোখের পলক ফেলার আগেই তলিয়ে গেল জলের নীচে!

আমার কি কিছুই করার নেই? ওরা একে-একে ডুবছে দেখা ছাড়া আর-কিছু-কি আমি করতে পারি না?...চোখে পড়ল ফুট তিরিশেক দূরে গাছের একটা গুঁড়ি—এ-বিপদ থেকে ও হয়তো বাঁচাতে পারে। বাতাসের মুখোমুখী চোখ বুজে এগিয়ে চললাম।

"ফেলিসিটাস, ফেলিসিটাস," গুঁড়ির তলা দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা হাত; খাবলে ধরলাম। "চলে এসো," মার্কসের গলা, "আর একটু, আর একটু।" দম ফুরিয়ে এসেছে; ওদের কাছে পৌঁছেই এলিয়ে পড়লাম। ওরাও কাঁপছে হি-হি ক'রে—রেমনড, ডেভিড, মার্কাস, মেরী। বেঁচে আছে আমারই মতো। বাকীদের কী হল? আমার প্রিয় সখী—ফিলোর?...ওকে-যে আমায় খুঁজে বা'র করতেই হবে, মদত দিতে হবে, বাঁচাতে হবে!

"ফিলো," বাতাসে মুখ রেখে পাগলের মতো ডাকতে লাগলাম, "ফিলো-ও-ও-ও-ও!"

"না, ফেলিসিটাস, না। এখন আর কিছু করা যাবে না। ঝড়টা থামতে দাও।"

ঝড় থামলে ! অসহায়ভাবে কেঁপে উঠলাম। আমার মুখের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। নদীর ? নাকি, আমারই চোখের জল !

হঠাৎ মেরীর গলা : "শোনো তো ! কে-যেন ডাকছে না ?"

কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ, একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, খুব নীচু গলায় : "বাঁচাও, বাঁচাও।"

"আরে, এ-যে স্যামুয়েল ডুং ডুং ! যীশু ! যীশু !"

"ও ডুবে যাবে !...সাঁতার জানে না, আসতে পারবে না এখানে।...হায় ভগবান, ও তলিয়ে যাবে !"—মেরী কেঁদে উঠল।

বাতাসের হিস্‌হিস্ আর জলের গোঁ-গোঁ ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না।

মেরীর চোখের দিকে তাকালাম, ভয়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে।...তারপর মার্কাস, রেমনড, ডভিডের দিকে। কেউ নড়ল না।

"বাচাও !"

আবার ডাকছে !...আমাদের চোখের সামনে ডুবতে চলেছে স্যামুয়েল ডুং ডুং, আমাদের ভাই !

কোথা থেকে, কেমন করে জানি না, আমার ভেতর-বাইরে কেমন-যেন অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল। গুঁড়ির ওপর উঠে বসে শাড়িটা খুলে ফেলে পুঁটলি করে সায়ার সঙ্গে লটকে নিলাম। তারপর গলা তুলে সেই আঁধারকালো মাতাল জলের ওপর দিয়ে চিৎকার ছুঁড়ে দিলাম, "স্যামুয়েল, স্যামুয়েল ডুং ডুং, সবুর কর ভাই, আমি আসছি।"—ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে।

বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে সাঁতার দিয়ে চলেছি। সায়া-শাড়ী জলে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। আবার ডাকলাব, "স্যামুয়েল ! এখানে, এখানে।"

কী-যেন একটা ঝটকা দিয়ে উঠল—হাত একটা, মাথা...স্যামুয়েলের ! এতো কাছে যে ওর চোখের ভয়টাও দেখতে পেলাম, শুনতে পেলাম ওর কাতর ডাক : "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।"

কোমর থেকে শাড়িটা বা'র করে নিয়ে একটা দিক দাঁতে চেপে ধরলাম, পুঁটলিটা ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে : "শাড়িটা ধর্...তোকে টেনে তুলে নেব... নে, ধর্।" কিনতু বাতাসের ধাক্কায় ওটা চলে গেল ওদিকে, ওর নাগালের বাইরে।

"ধর্ ওটাকে ডুং ডুং।"

বুক ধুকপুক করছে। জল কাটতে কাটতে দেখতে লাগলাম—জোরে জোরে হাত পা ছুঁড়ে স্যামুয়েল ওটার কাছে যেতে চাইছে।

"ধর্ ডুং ডুং, ঠিক করে ধর্"—পেছন থেকে ভেসে এল কথাগুলো।

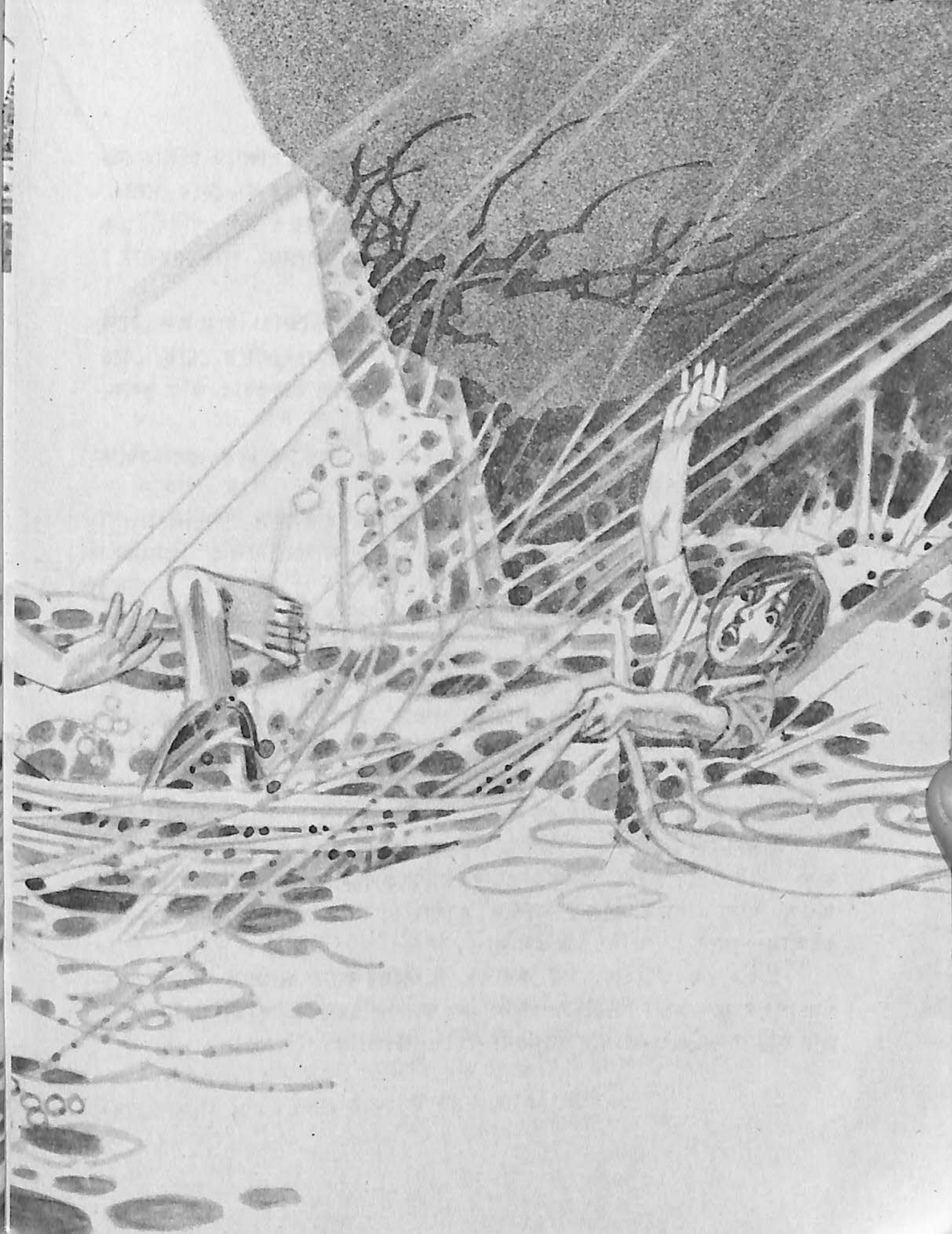
"ওহ্ যীশু, ও পারছে না,…ডুবে যাবে, ও ডুবে যাবে!"

আঁধারের কোনো-একখান থেকে মার্কাসের গলা শুনতে পেলাম: "ফেলিসিটাস, ফেলিসিটাস, ফিরে এসো।"

ফিরব। ফিরতে চাই আমিও। কিনতু স্যামুয়েলকে না নিয়ে নয়। কখখনও নয়।

আচমকা শাড়িতে টান পড়ল! এতো জোরে যে দাঁত ফস্কে বেরিয়েই যাচ্ছিল। প্রাণপণে কামড়ে ধরে, ঘুরে গিয়ে, গুঁড়ির দিকে ফিরে চললাম জলে





পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ঠোঁট চেপে, পা ছুঁড়ে, হাত চালাতে চালাতে চলেছি তো চলেইছি। একসময়ে মনে হল : পারব না, আমি পারলাম না, হেরে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম ! চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যাবার আগে এই পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো দেখব বলে চোখ দুটো একবার খুললাম...আর দেখলাম : সামনেই চারজোড়া চোখ ভয়মাখানো !

"এসো, এসো, ফেলিসিটাস !" গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে জল ঠেলে সামনে এগিয়ে গেলাম, এবং মার্কাসের হাত ধরে ফেললাম—পৌঁছে গেছি, বেঁচে গেছি !...দুজনে মিলে তুলে নিলাম স্যামুয়েলকে—কাশল কয়েকবার, উকি তুলল, হড়্‌হড়্‌ বমি করে ফেলল—জল শুধু জল !

বেদম হয়ে, কাঁপতে কাঁপতে আমরা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে জপ করতে লাগলাম : "হে প্রভু, আমাদের পিতা...।"

"বাঁচাও"—বাতাস আবার বয়ে নিয়ে এল আমাদের কাছে : "বাঁচা-া-া-ও !"

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে স্যামুয়েল ডুং ডুং তাকাল আমার দিকে : "কিনডো ! ডুবছে !" ফিসফিস করে বলল।

চুপ। কোন কথা বলতে পারছি না আমরা কেউই। বাতাসও বুঝি ভুলে গেছে শ্বাস নিতে !

কেঁপে উঠলাম থরথর করে। তারপর খুব ধীরে ধীরে, অনেকটা অচেতন-ভাবেই, দাঁড়িয়ে উঠলাম গুঁড়ির ওপর। আবার ঝাঁপ দিলাম চোখ বুজে, সেই রাগী দুরন্ত অশান্ত কালো জলের অতলে !

* * * *

ঝড়ের দাপট থেমে গেল এক সময়ে।

গাছটা ছেড়ে দিয়ে আমরা সাঁতরে চলে এলাম তীরে। সেখানে, আমরা যারা বেঁচে গিয়েছিলাম, জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আর কেউ যদি ফিরে আসে, আসতে পারে, তাদের আশায় আশায়। অনেকখন আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম—বৃথাই। আর কেউ এল না !

1965 ফেবরুয়ারীর সেই ভয়ংকর দুর্যোগের রাতে আমাদের দলের প্রায় পন্‌চাশজন ডুবে মারা গিয়েছিল—লিও এবং তার পরিবারের সবাই, মার্গারেট ও তার কচি বাচ্চা, এবং আমার প্রিয়তমা সখী—ফিলো !!

ডাকাত ! ডাকাত !!

সাল 1980, মাস ফেবরুয়ারী, একটি বিশেষ রাত—যেমন ঘন কালি ঢালা, তেমনি ঠাণ্ডা কনকনে !

আকাশ জুড়ে দলা-দলা কালো মেঘের ভিড় ; ভিড় কাটিয়ে বাইরে আসতে চাইছিল রূপোলি চাঁদ, বারবার ; শেষে, হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।...তাজা বরফের খুশবু নিয়ে দূর পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমে-আসা এক দংগল হিমেল হাওয়া হুটোপাটি করছিল উত্তর প্রদেশের ছোট্ট হরিজন-গাঁ রামনগরের জনহীন গলি-উপগলিতে। ভারী কাঠের দরজাগুলো খড়্খড়িয়ে, ভরাট লোহার কড়াগুলো ঝন্ঝনিয়ে, ওরা যেন ঢুকতে চাইছিল অন্দর মহলে। সুবিধে করতে না পেরে শেষে দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ল কাদা-পাথরের বাড়ি গুলোর উঁচু-উঁচু জানলায়, আর সুড়ুৎ করে গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল উঠোনময়, তারপর মনের সুখে খেলা করতে লাগল।

হিস্হিস্ আওয়াজ তুলছিল সাপুড়ে বাতাস। আর, তাই শুনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সতীশ কুমার ফুলসিং রসুইখানার পাশের ঘরের এক কোণে পাতলা লেপের তলায়। লেপ ফুটো করে শীত লুকোচুরি খেলছিল ওর সাথে।

একটা খাটিয়ায় বাবা শুয়ে। একবার কেশে উঠলেন, পাশ ফিরলেন তারপর। আরেকটায় ছোট বোন সীতা আরও লেপটে গেল মায়ের নরম-গরম কোলে। "টশ্শ্শ্", ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই মা বিড়বিড় করে ছেঁড়া কম্বলটা টেনে দিলেন মেয়ের গায়ের ওপর। ভাই শুয়েছিল পাশেই, নড়ে উঠল, গজ্গজ্ করল, "হেঃ, বহুৎ ঠান্ডী ! গায়ে দিবার আর কুছ্ নাই ?"

নেই ! জানত সতীশ। আটজনের বড় সংসার—গতর খাটিয়ে ওদের বাবা এবং রিক্শা চালিয়ে বড় ভাই বিনোদ যে ক'টা টাকা ঘরে আনত, তা দিয়ে পেট চালানোই দায় ; লেপ-কম্বল জোটাবে কোথা থেকে !

সতীশও কিছু রোজগার করত চাচা মানচান্দদের গাই-মোষ দেখ্‌ভাল ক'রে। মানচান্দরা যে বড়লোক, তা কিনতু নয়। আসলে, চাচা-চাচী দুজনেরই বয়স হয়েছে; ছেলেরাও কাছে থাকে না; অনেকদিন হল চলে গেছে ঝলমলে শহর পাটনায়, কপাল ফেরাতে। তারপর থেকে ওদের আর কোন খবরই পান নি চাচা-চাচী।...সতীশ কুমার ফুলসিং আরেকবার কেঁপে উঠল—শীতের ছোঁয়ায় নয়, অজানা আগামী দিনের ভয়-ভাবনায়। গরিবের জীবনে অশেষ দুর্গতি—সচ্!

ওই যে, আবার!...উঁহুঁ বাতাস তো না। ছাদের ওপর খালি পায়ের থপ্‌থপ্ চলা! সেই সাথে চাপা গলার হুকুমজারি: "আরো এগিয়ে শাগরেদ... বাঁয়ে...দুসরা বাড়ি।...বললুম না—পরেরটা?"

সতীশ হিম!

"সতীশ," আঁধার-ঘরে বাপের গলা, "কুছ্ বললি?"

"না বাপ!...মালুম হয়—বাইরে আদমি আচে।"

"কে? কে? কুথা?" ভয় পেয়ে মা চেঁচালেন, "বাচুর, উয়ারা বাচুর লিতে এয়েচে!"

"সড়কের কুত্‌তা-টুত্‌তা হবে", বাবা বিজ্‌বিজ্ করে বললেন বটে, ঠিক মনঃপূত হল না। "তালাটা মেরে দি'।"

পা ঘষটে-ঘষটে বাপ চটি খুঁজছেন—সতীশ শুনল শুয়ে শুয়ে।

আচমকা চিল-চিৎকার একটা। রাতের বুক খান খান হয়ে গেল! তারপরেই কাঠের ওপর দুম্‌দাম্ ঘুষি! এবং—একটা খড়্‌খড়ে গলার খিঁক্‌খিঁক্ শাসানি: "খোলো...খোলো...লাহয় গোলি চালাবো।"

ছোট ঘরটায় সবাই পাথর!

শুধু মা বললেন চাপা গলায়, "সব্বোনাশ্...ডাকাত!"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাবা পোঁছে গেছেন দরজার কাছে, টেনে খুলে ফেলেছেন ভারী পাল্লা। গলা দাবিয়ে সতীশ জানাল: "হম্ ভী এলম।" বলেই বাবাকে পাশ কাটিয়ে নেমে পড়ল উঠোনে।

ঘুট্‌ঘুটে আঁধার। একটা বন্দুকের আওয়াজ। নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার: "বাঁচাও, বাঁচাও, ডাকাত!"

সতীশের কাঁধে বাপের চওড়া ভারী থাবা, চাপা গলার নিষেধ: "ঠাহর যা!"...দাঁড়িয়ে পড়ল সতীশ; ওর চোখ চলতে লাগল রাত-আঁধারী আনাচে-কানাচে।...

সময়ও কি দাঁড়িয়ে পড়েছে ?

হঠাৎ একটা কালো ছায়া লাফিয়ে পড়ল মানচান্দদের বাড়ির ভেতরে, চোখের পলকে কালো আঁধারে মিশে গেল।

সতীশের ফিসফিসানি : "চাচার ছাদে ওরা !...এ্যাট্‌টা কুছ করতি হয় !"

"শ্‌শ্‌শ্‌, বেটা ! আরও আদমি চাই।"

"তব্‌ হামি গেলম"—উঠোনে নামল সতীশ।

মাঝ-বরাবর গেছে, পরপর তিনটে গুলি। তার সাথে ধমকি : "দরজা খোল্ কুত্‌তারা, লাহয় ভেংগে ঢুকবো !"

বুড়ী মা-মানচান্দের ভীত চিৎকার সতীশের শিরদাড়ায় কাঁপন ধরিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি পা চালাল ও ; নিজেকে নিজে বলল : 'উরা অন্দরে ঢুকে পড়েচে... সবাইকে খবর করতি হবে...জল্‌দী, সতীশ, জল্‌দী !' আর—ছায়ার মতো দেয়াল লেপটে ভীষণ চুপিসাড়ে ছুটে চলল গলিপথ ধরে।

সারি সারি কোঠী। দরজায় দরজায় ধাক্কা দেয় আর চিৎকার করে : "উঠে যান, চাচা, উঠে যান !...বাঁচান, বাঁচান !...মানচান্দচাচার কোঠি ডাকাত হামলা করচে !...বাঁচান !...ডাকাত ! ডাকাত !

দরজা খুলে যায় দুম্‌দাম্। জানলার শিকের পেছন থেকে ঘুমমাখানো মুখগুলো ভুরু কোঁচকায় : "ক্যা হুয়া, সতীশ ? কিসের হাংগামা ?...বন্দুকের আওয়াজ ফুট্‌ করল যেন !"

"ডাকাত ! ডাকাত !" সতীশ সমানে চেঁচাতে থাকে, "চাচা মানচান্দের কোঠিপর হামলা...বন্দুক লিয়ে চলো...নহী তো, গোটা গাঁ লুটে লেবে !"

"বন্দুক !"—অবাক এক বুড়ো শুধোয় : "গাঁয়ে বন্দুক কুথা ? হমসব গরিব যে বাপ ! হাতের এই মুঠোটি ছাড়া লড়ার আর কুনো হাতিয়ার লাই... এই ধুকধুকে পেরাণডা ছাড়া হারাবার আর কিছু লাই !"

"তো ভী হম লড়বে", আরজন বলে ওঠে, "লাঠি, পাথর, লোহার ডাণডা, যা আচে, লে চলো।...জল্‌দী !"

সতীশ দাঁড়ায় না, দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যায়— "ওঠো, জাগো, ডাকাত...ডাকাত !"

বনে আগুন লাগার মতো হু হু করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ের একোণে-ওকোণে, জনে-জনে লোক ছুটে চলল মানচান্দদের বাড়িমুখো ; মুখ থমথমে, হাতে লাঠি, হাঁসুয়া।

"ভাগ, ইঁদুর-বাচ্চারা! নইলে, কুত্তার মতো গুলি করে মারব"—দূর থেকেই ওরা শুনতে পেল ডাকাতদের তর্জন-গর্জন।

"হেই, উরা যে মোদের মেরে ফেলবে গো!"

"হা সব কটাকে; কেও বাদ যাবেক লাই!"—শাসানির সংগে ছুটে এল দুটো গুলি আঁধার ভেদ করে।

"বাড়িটা ঘেরাও করি, আসো," সতীশের বাবার চাপা গলা, "পাঁচিলে ওঠো, যি কোরেই হোক।"

"কিভাবে?" শুধোল লটকানো-গোঁফ, ছোট্টো-খাট্টো একটি মানুষ, পাতলা পাজামা-জামার ভেতরে ঠকঠক কাঁপছে। "মোদের লাকের ডগাটুকু দেখেচে কি গুলি চালিয়েচে!"

"আঁধার-রাত মোদের বড়ো সহায় গো। উরা মোদেরকে দেখ্‌তি পাবেক নাই", মৃদু অথচ সতেজ গলায় জবাব দিল বিনোদকুমার ফুলসিং—"চলো দিকিন!"

"মোরাও ত' দেখ্‌তি পাবক লাই উয়াদেরকে", তবু কাঁইকাঁই করে হাড়-জিরজিরে লোকটা।

এইসব সলা-পরামর্শ চলছে, এক ফাঁকে সতীশ সরে আসে সবার চোখ এড়িয়ে। বাড়িগুলোর অন্ধি-সন্ধি ওর নখ দর্পণে। নিজেদের দিকের উঠোনের দেয়াল বেয়ে বেড়ালের মতো নিঃসাড়ে ও ওপরে উঠতে থাকে। ঠাণ্ডা এবড়ো-খেবড়ো পাথর ধরে ধরে আঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপরে পৌঁছেই মুখ ঘোরাল পড়শীর উঠোনে।...মানচান্দচাচার ছাদ পেরিয়ে দুটো ছায়া আঁধারের পেটে ঢুকে গেল। ডানদিকের কোণে তেঁতুল গাছের পেছন থেকে চোখ মেলল একটা সার্চলাইট... সতীশের চোখ ধাঁধিয়ে গেল হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে।

উফ্‌, ব্যাটারা ব্যাটারিও এনেছে সাথে!...আলোটা মুখ নীচু করল, জমির ওপর দিয়ে চলতে-চলতে এঁকেবেঁকে ঘুরতে লাগল দরজাগুলোর ওপর। গাছের পেছন থেকে আবার হুমকি এল: "এ্যাক জনাও এট্টু হেলেচো কি সব কটা মরবে—হাঁ!"

আলোর ফুলকি ঘুরপাক খায় অনবরত। চট করে মাথাটা নামিয়ে না ফেললে সতীশের মুখেই এসে পড়ত। "শয়তানের দল!" দাঁতে দাঁত চেপে ও হিস্‌হিসিয়ে ওঠে, "দাঁড়া মজা দ্যাখাবো তুসবকে!" ঠিক তখনই ছাদের তিনটে থামের একটার পেছন থেকে আর-একটা লোক নীচু হয়ে টিট্‌কিরি দিতে থাকে: "আ বে চুহার দল, গাড্ডায় ফিরৎ যা...যা!"

সতীশ দেখল পুরোটা। রাগে শরীর রী-রী করতে লাগল।

বন্দুক তাগ্ ক'রে, পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে জানোয়ারের মতো কুৎসিত লোকটা। ওর দিকে চোখ রেখে, পাঁচিলের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সতীশ এগিয়ে চলল চাচার বাড়ির কাছাকাছি।

ফস্ করে আলোটা ছুটে এল সতীশের দিকে। উপুড় হয়ে ও শুয়ে পড়ল পাঁচিলের ওপর।...শুয়েই রইল। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা—দেখে ফেলেচে কি খতম্!...কে জানে কেন, ফুট-তিনেক দূরে এসে আলোটা দাঁড়িয়ে পড়ল, চক্কর খেল, আবার দৌড়ে গেল দরজায়-দরজায়।

শুয়ে-শুয়েই পাঁচিলের গাঁথুনিতে আঁচড় কাটতে লাগল সতীশ। হাতে ঠেকল একটা আলগা ইঁট, ছাড়িয়ে নিল। সংগে সংগে হাঁটুতে ভর করে সোজা হয়ে গেল, নিশানটা মেপে নিল, তারপর গায়ে যতো জোর আছে সবটুকু দিয়ে ইঁটটা ছুঁড়ে দিল বন্দুকধারীর দিকে। দশ গজও হবে না। ইঁটটা এতো জোরে গিয়ে পড়ল যে বন্দুক সমেত লোকটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। নিজেদের উঠোনে লাফিয়ে পড়ার আগেই সতীশ দেখল: ডাকাতটা ধড়্ফড়্ করে উঠে পড়েই গাঁ-গাঁ ডাক শুরু করে দিয়েছে, "পাক্ড়ো, খতম্ করো!" ব'লেই, গালে বন্দুক ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপল—একবার, দুবার, তিনবার। বন্দুক কোন সাড়াই দিল না।

বেশ খুশি হয়েই সতীশ মাটিতে পা দিল। জমি ছু্য়েই ছুটে গেল বাইরে পথের ওপর, সোজা বাপের দু বাহুর ঘেরে।

বাবা বললেন, "উয়ারা সব মিলে ন'জন, হরেকের পাস রাইফিল, তার উপর ওই আলো। মোদের যে কিছুই নাই, বাপ!"

"মোদের রাইফিল নাই, কিনতুক আলো তো বানাতে পারি।" ব'লেই সতীশ ঘুরে উঠোনের দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে চলে এলো যেখানে এক কোণে দাঁড়িয়ে ওদের ভয়পাওয়া ছোট বাছুরটা 'হাম্বা হাম্বা' করছে। চটজলদী খানিকটা খড় ছিঁড়ে নিয়ে, পাকিয়ে, একটা টাইট বানডিল তৈরি করল। "চুক্ চুক্ চুক্"—ভয়ে জড়োসড়ো বাছুরটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ছুটে ফিরে এল গলিতে। সেখানে তখন মানচান্দদের দরজা ঘিরে গাঁয়ের লোকেদের রীতিমতো ভীড়।

হাঁসুয়া উঁচিয়ে ধরল কত্তার সিং: "ভাইসব! চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকলে গাঁওকে বাঁচানো যাবেক নেহি—"



"তবে ?"

"ইট লও, পথ্থর লাও, জোশী হাতিয়ার মিলে, লাও।"

চওড়া কাঁধওলা লোকটার কনুই ছুঁল সতীশ, "চাচা, দিয়াসলাই আচে ?"

"দিয়াসলাই ?" আনমনা কত্তার সিং ভুরু দুটো বাঁকাল, "ও হাঁ, দিয়াসলাই।" পকেট হাতড়ে বাকসটা সতীশের হাতে দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল তালামারা দরজার সামনে এবং সতেজে বলল, "এটা ভেংগে ঢুকে পড়ো... ছাদের উপর যাও।...তুমরা কি সব ডরপোক হয়ে গেলে নাকি ? লাও, এসো—"

"আমি লড়বো...হামি...আম্মো লড়বো..."

"হামিও লড়বো", সতীশের বাবা বললেন।

"হম্ভি"—কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সতীশ টুক্ ক'রে বাড়ির উঠোনের দিকে ফিরে গেল। দেয়ালের গায়ে একটা বড় ফুটো আছে, ওটাই ওর নিশানা এখন...খড়ের বানডিলের ওপর দেশলাইকাঠি মারার সময় হাতদুটো ভীষণ কাঁপছিল। বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা। ফুঁ দিয়ে আগুনটা ধরাতেই খড় চড়্বড়্ করে উঠল, চোখে ধোঁয়া ঢুকে গেল, গলা খুক্খুক্ করতে থাকল। কোনরকমে সামলে, দেয়ালের ফুটোটা দিয়ে ও খুব সাবধানে উঁকি মারল—ওপাশে গোটা উঠোনটা কালোয় কালো। সার্চলাইট নেভানো।

"এইবার", সতীশ মনে মনে বলল, "ইস্পার ইয়া উস্পার !"

ফুটোটা গ'লে ও গিয়ে পড়ল পাঁচিলের ওপাশে ; তারপর হাত গলিয়ে মশালটা বার করে নিয়েই ছুঁড়ে দিল মানচান্দদের উঠোনের মাঝবরাবর। আঁধার-আকাশে ধুমকেতুর মতো উড়ে গিয়ে ওটা ঝুপ্ করে পড়ল মাটিতে ; উঠোনটা আলোয় আলো হয়ে গেল। কতকগুলো কালো ছায়া লাফ মেরে গাছ, থাম, বাক্সের পেছনে আড়াল নিল।

"গোলি মারো...গুলি করো ওকে—"

সতীশ ছুট দিল তাড়া-খাওয়া খরগোসের মতো এঁকেবেঁকে। উঠোনটা পার হবার সময় গুলির পর গুলি ছুটে গেল ওর আশপাশ দিয়ে।

"বটে !" মুখে দাড়ির জংগল একটা গাঁট্টা-সাঁট্টা লোক বারান্দা থেকে আওয়াজ দিল, "তবে, এই নে !" রাইফেল তুলল নিশান টিপ্ ক'রে।

বাঁদিকে মোড় নিয়েই সতীশ ঝাঁপিয়ে পড়ল গুছিয়ে-রাখা ঘুঁটের এক বিরাট গাদায়। দম ফুরিয়ে গেছে, পাঁজরে হাজারটা ছুঁচ ফুটছে, গাদার ভেতর একেবারে সেঁধিয়ে গিয়ে সতীশ নিথর পড়ে রইল।





শুরু হল গোবর-গাদায় গুলির বর্ষণ। যেমন হয় লড়াইয়ের ময়দানে।... তারপর একসময়ে বন্দুক-রাইফেল সব চুপ করে গেল। ডাকাতদের একজন আদেশ হাঁকল: "আগুনটা হটিয়ে দে...পা দে দাবা।"

"এ্যাঁ! ওহ্, না, না, ওটাই তো মোদের সবচে' বড়ো হাতিয়ার!" ভাবতে ভাবতে সতীশ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল: কালো প্যান্ট-শার্ট পরা একজন ডাকাত এগিয়ে আসছে লাফ মেরে, আগুনটা নেভাতে। হঠাৎ একটা ইট এসে পড়ল ওর পিঠে, কাঁধ বরাবর। "বাপ্," ব'লেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। পেছনে তাকিয়ে সতীশ দেখল, কিসেন চাচার বিজয়ী মুখটা মিলিয়ে গেল পাঁচিলের ওপাশে।

"পাকড়ো পাকড়ো, বদমাশদের!" বাপের উৎসাহ-বাণীতে সতীশের দেহে নতুন বল এল। হাতিয়ারের খোঁজে ইতি-উতি দেখতে দেখতে হাতে ঠেকল খানকয় ইট। একটা তুলে নিল, এবং সাবধানতার সব নিয়ম ভুলে গিয়ে, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিল সামনে। পড়ে-যাওয়া ডাকাতটা সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, থানটা গিয়ে পড়ল ওর থুতনিতে। থতমত খেয়ে লোকটা পিছু হটে গিয়ে চোয়াল চেপে ধরে কাতরাতে লাগল। মুখটা বেঁকে গেল রাগের চোটে, পাশ ফিরে গণগণে চোখে তাকাল মারদেনেওয়ালার দিকে—হাতের কাছে পেলে, আগুনের বদলে ওকেই পিষে ছাতু বানিয়ে দেবে! মশালের ধিকিধিকি আলোয় এক লহমার তরে দুজনের চোখাচোখি হল—মানুষের চোখে যে এতো রাগ, এতো ঘৃণা থাকতে পারে, সতীশ জীবনে কখনও দেখেনি! কাঁপতে কাঁপতে নীচু হয়ে আর একটা থান ইট তুলে নিল। এবারে চোটটা গিয়ে পড়ল কপালে। দুপাক খেয়ে শয়তানটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সীমাহীন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সতীশ, "হুয়ো, হুয়ো!" লাফাতে লাফাতে তৃতীয় ইটটা তুলে নিল। এবার ওর নিশানা: গরুর গাড়ীর পেছনে লুকিয়ে থাকা ডাকাতগুলো। এবারেও ওর টিপ নিখুঁত।

কিনতু মশালের আলোই ওকে ধরিয়ে দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ইটটা ছুঁড়তে যাবে, একটা গুলি এসে বিঁধল ওর মুখের ডানদিকে। ইটটা তখনও ডানহাতের কাবুতে, সতীশ কুমার ফুলসিং নিরবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"সতীশ, বেটা!"—বাপের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পেল না সতীশ কুমার ফুলসিং, খেপেওঠা গ্রামবাসীদের গুরু-গর্জনও না, যখন চারদিক থেকে ওরা

গলগল্ করে ঢুকে পড়েছে মানচান্দদের লড়াইয়ের ময়দানে। শুধু আবছা-আবছা মনে আছে : ভাই এসে ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল একটা ঘরের ভেতরে, তারপর অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তার পরে কী হল, ও জানে না।

সে কী ভয়ানক ধুমধাড়াক্কা সারা উঠোন জুড়ে! গাঁয়ের লোকেরা দুটি ঘণ্টা সমানে যুঝেছিল ইট পাথর লাঠি হাঁসুয়া হাতের মুঠো, যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে; লড়াই করেছিল নিজেদের ও পরিবারের জান-মান বাঁচাতে; লড়ে গিয়েছিল শেষতক, যখন ডাকাতদলের সদ ার ধরা পড়ল এবং পেছনে হাতবাঁধা হয়ে ধুলোতেই হাঁটু পেতে বসে গেল সবার সামনে। সবশেষে, পুলিশ এসে সদ ারসমেত ডাকাতদলের সবাইকে চালান ক'রে দিল।

এ সবের কোন-কিছুই ও দুচোখ ভরে দেখতে পেল না, এই সকল প্রতিরোধের পয়লা নম্বর নায়ক যে!

কিনতু গাঁয়ের কেউই কোনদিন ভুলবে না, ভুলতে পারবে না সেই ভয়ংকর রাতের এক-একটি মিনিটকে, সেকেনডকে।

এবং রামনগরের কেউই ভুলবে না, ভুলতে পারবে না : ন'টা নিদ য় ডাকাতের হাত থেকে গোটা গাঁ-কে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ডান চোখটি দান করেছে যে, সেই সহজ সরল সাহসী বালকটিকেও।

সয়াল লহমুবাঈ ভোয়া-র জন্ম গুজরাতে 1967 সালের 1 জুন। পড়াশোনা প্রাথমিক পাঠশালায়। মাতৃভাষা গুজরাতী। সংসারে দুই ভাই, দুই বোন। বাবা শ্রমিক। শখ : বইপড়া, গান, খেলাধুলা।





সী গোবিন্দন তামিলনাড়ুবাসী, জন্ম 1966 সালের 15 এপ্রিল। পড়াশোনা কুরুবরপল্লী হাই স্কুলে। মাতৃভাষা তামিল ; ইংরেজীও জানে। মোট সাত ভাই, দুই বোন। বাবা শ্রমিক। শখ : বইপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলা।

সোনিয়া সিনহা-র জন্ম বিহারে 1969 সালের 3 নভেম্বর। পড়াশোনা পাটনার সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট-এ। মাতৃভাষা হিন্দী ; ইংরেজীও জানে। ওরা দুই বোন, এক ভাই। বাবা ছিলেন শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ; গ্রন্থে বর্ণিত অগ্নি-দুর্ঘটনায় মারা যান। শখ : বইপড়া, খেলাধুলা।



শত্রুঘ্নলাল শাহ-র জন্ম মধ্যপ্রদেশে 1966 সালের 16 ডিসেম্বর। পড়াশোনা দুর্গ্-এর নেহরু প্রাথমিক পাঠশালায়। ছত্তিশগড়ী ও হিন্দী, দুই ভাষাতেই সমান দক্ষ। পিতামাতার দেহান্তের পর জিলা সাহু সংঘ ওর পালন-পোষণের ভার গ্রহণ করে। ইঞ্জিনিয়ার হবার আশা পোষণ করে।
শখ : অ্যাডভেঞ্চার-গল্প পড়া, খেলাধুলা এবং নৌটংকী ইত্যাদি লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান।





ফেলিসিটাস সোরেং-এর জন্ম উড়িষ্যায়, 1950 সালের 21 জুন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে রৌরকেল্লার সরকারী হাসপাতালে নার্সিংয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে। মাতৃভাষা ওড়িয়া ছাড়া হিন্দী ও ইংরেজীও জানে। ওকে নিয়ে ছয় বোন, দুই ভাই।
শখ : গানবাজনা, হস্তশিল্প।

সতীশ কুমার ফুলসিং-এর জন্ম উত্তরপ্রদেশে 1968 সালে। স্কুল-পাঠশালায় কোনদিন যায় নি। অন্য লোকদের গরু-মোষ চরিয়ে সংসারকে সাহায্য করে। মাতৃভাষা হিন্দী। তিন ভাইয়ের মধ্যে ও সবচেয়ে ছোট ; বোন একটি। বাবা শ্রমিক।



এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির প্রত্যেকটি নির্ভেজাল বাস্তব। বিভিন্ন ঘটনা তথা দুর্ঘটনায় ছয়টি কিশোর-কিশোরী যে অসাধারণ সাহস ও দুর্লভ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তার স্মরণিকায় তাদের ভূষিত করা হয়েছিল জাতীয় পুরস্কারে।

সুনির্বাচিত প্রশ্নমালা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং উল্লিখিত জাতীয় পুরস্কারের উদ্যোক্তা ইনডিয়ান কাউনসিল ফর চাইলড ওয়েলফেয়ার সংগৃহীত যাবতীয় তথ্যের সমবায়ে, এবং তার সঙ্গে সৃজনী কল্পনা মিশিয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে লেখিকা এমন সযত্ন-সৌন্দর্যে উপস্থাপিত করেছেন, যা গল্পের মতোই আকর্ষণীয়, নাটকের মতো উত্তেজক এবং জীবনের চেয়েও জীবন্ত ॥







National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

nbt